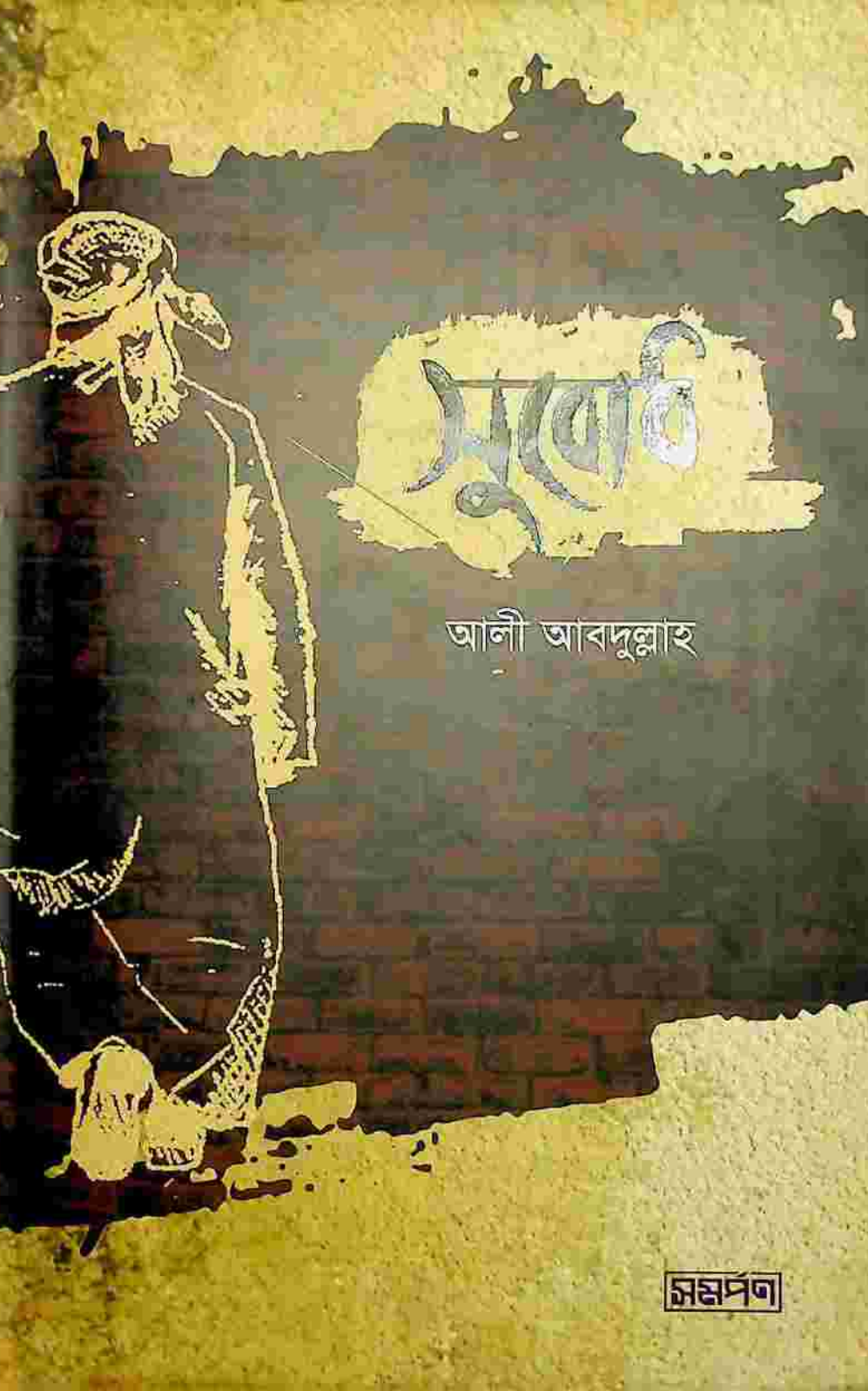


মুখোশ

আলী আবদুল্লাহ

সমর্পণ

সুবোধ

আলী আব্দুল্লাহ

শার'ঈ সম্পাদনা
আলী হাসান উসামা

সমর্পণ

সুবোধ

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০১৮

ISBN : 978-984-34-3412-8

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই :
বই কারিগর, ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক :
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ

মূল্য : ২২০ টাকা

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন
সমর্পণ প্রকাশন
৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
facebook.com/somorponprokashon

“

জহুরুল সাহেব গুড় কামড় দিয়ে মুড়ি চাবাচ্ছেন। মচ মচ শব্দ চার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনতে ভালোই লাগছে। আল্লাহ কার রিজিক কোথায় রেখেছেন সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। হয়তো আমার মেসের খাবারে জহুরুল সাহেবের নাম লেখা আছে। সেই খাবার চাহিলেও আমি খেতে পারব না। জহুরুল সাহেবের জন্যে যা বরাদ্দ আছে সেটা তো আল্লাহ তাকে দেবেনই।

”

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। সালাম ও দুরুদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি। সালাম বর্ষিত হোক অগণিত সাহাবীদের প্রতি।

রাস্তায় রাস্তায় গ্রাফিটিতে যেই সুবোধকে দেখা যায়। তার সাথে এই সুবোধের কোন সম্পর্ক নেই। সুবোধ অর্থ উত্তম বুদ্ধি বা জ্ঞান। আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এই সুবোধ আগেও ছিলো। এখনও আছে। খুব পরিচিত একজনার সাথে আবার পরিচয় করিয়ে দিতে আমাদের এই সুবোধ এসেছে। আগে হয়ত সুবোধের রূপ টা ভিন্ন ছিল কিন্তু এবার সে এসেছে আব্দুল্লাহ হয়ে।

আলী আব্দুল্লাহ
১৩ই জুমাদাল উলা ,১৪৩৯ হিজরি
মঙ্গলবার।

সম্পাদকের মূল্যায়ন

সুবোধ থেকে আব্দুল্লাহ। একজন ব্যক্তি। একটি চরিত্র। উম্মাহর ক্রান্তিকালে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বেরিয়ে এলে, প্রবৃত্তিপূজার জীবন ছেড়ে গুরাবা'র জীবন অবলম্বন করলে কোন ধরনের নির্মম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়-বাস্তবতার সেই সকরুণ চিত্র ফুটে উঠেছে আলী আব্দুল্লাহ ভাইয়ের 'সুবোধে'। এটা শুধু এক সুবোধের কল্পিত জীবনধারা নয়, বরং এতে আদতে এক সুবোধ প্রতিনিধিত্ব করছে হাজারো সুবোধের। আশা করি, বইটি ইসলামপ্রিয় মানুষদের ভালো লাগবে এবং দীনের পথে অবিচল থাকার প্রেরণা জোগাবে।

বক্ষ্যমাণ বইয়ে উপন্যাসের পিঠে ভর করে উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বারতা এবং উত্তম কিছু নির্দেশনা। ব্যক্তিগতভাবে বইটি আমাকে দারুণভাবে চমৎকৃত করেছে। সুবোধ এককালে ওদের থাকলেও সুবোধ এখন আমাদের। এভাবে একদিন ইন শা আল্লাহ এ ধরনের প্রতিভাগুলো জাহিলিয়াত এবং অন্ধকার থেকে পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসবে, আলোর মাঝেই তারা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মরা বেড়ে ওঠবে,'রাযি রাহে রহমান ভি আওর খোশ রাহে শয়তান ভি'-টাইপের ইসলাম-পালনের নিন্দনীয় পন্থার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ইসলামে রয়েছে দাওয়াহর নির্দেশ-পূর্ণ দীনের দাওয়াহ; আকিদা-মানহাজ, চিন্তা-চেতনা, আখলাক-চরিত্র, ইমান-আমলের দাওয়াহ; ইমান বিল্লাহ এবং কুফর বিত তাগুতের দাওয়াহ; মিল্লাতে ইবরাহিম এবং আলওয়ালা ওয়াল বারার দাওয়াহ; আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাত-উলুহিয়্যাত-হাকিমিয়্যাতসহ পূর্ণ তাওহিদের দাওয়াহ। আমরা আমাদের দাওয়াহয় অবহেলা করলেও ক্রুসেডার এবং দাজ্জালের বাহিনীরা কিন্তু ঠিকই ওদের দাওয়াহ অব্যাহত রাখবে, সুযোগে-কৌশলে নীল নকশা অনুসারে ওরা ওদের গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে। এভাবে ক্রমশরা পৃথিবীটা ওদের হয়ে যাবে এবং ইসলামের অনুসারীদের জন্য তা বসবাসের অযোগ্য আবাসস্থল হিসেবে

বিবেচিত হবে।

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে তার ভেতর স্বভাবগতভাবে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমরা যদি উদ্যোগী হই, উর্বর মাটিতে দীনের বীজ বপন করি, তাহলে আমাদের সুবোধরা জাহিলিয়াতকে ত্যাগ করে পুনরায় ইসলামে ফিরবে এবং অন্যদের জন্যও হিদায়াতের আলোকবর্তিকায় পরিণত হবে ইন শা আল্লাহ। দাওয়াহ কোনো দল-গোষ্ঠীর একচ্ছত্র অধিকারভুক্ত সম্পত্তি নয়; বরং প্রতিটি মুসলিমই একেকজন দায়ি। নিজের ঘর থেকে শুরু করে জাতির কর্ণধার পর্যন্ত প্রত্যেককে ইসলামের দিকে, তাওহিদের আহ্বান করা এবং প্রত্যেকের সামনে তাগুত এবং জাহিলিয়াতের অসারতা খুলে খুলে বর্ণনা করা আমার, আপনার এবং সকলের দায়িত্ব।

সুবোধ বইটি যদিও মূলত একটি উপন্যাসধর্মী রচনা, এরপরও আমরা সার্বিকভাবে চেষ্টা করেছি, এতে যেন অসচেতনভাবে এমন কোনো শব্দ-বাক্য না থেকে যায়, যা কোনোভাবে শরিয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় বা শরিয়াহর কোনো বিধান-দৃষ্টিভঙ্গিকে আঘাত করে কিংবা শরিয়াহর সামগ্রিক ভাবমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। বক্ষ্যমাণ বইয়ে বাস্তবতার চিত্রায়ন করা হয়েছে মাত্র। তাই বাস্তবতার নিরিখেই সুবোধকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এজন্য তার এমন কোনো অতি ধার্মিক চিত্র তুলে ধরা হয়নি, যা বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্য হয় এবং সুবোধকে পাঠকের কাছে এক অভিনব ও অপরিচিত সত্তা হিসেবে বোধ হয়। বইটিকে তাই বাস্তবতার আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে। একজন মুসলিমের জীবনাচার কেমন হবে-এ বিষয়ে স্বতন্ত্র রচনা প্রচুর রয়েছে; এটা সে বিষয়ের বই নয়। ইলম শেখার জন্য আলিমগণের সান্নিধ্য গ্রহণ করা এবং প্রচুর বইপত্র পড়া একান্ত অপরিহার্য একটি বিষয়। গুগলে সার্চ করে কিংবা গল্প-উপন্যাসের চরিত্র থেকে পূর্ণ দীনদারির সবক নেওয়ার ভুল গণ্ডিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করার সংকীর্ণ মানসিকতা কোনো অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নয়।

আল্লাহ তাআলা সুবোধ'র লেখক, প্রকাশক, পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ীদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আগামীতে আমরা লেখকের থেকে আরও ভালো কিছু আশা করে ভূমিকাপর্বের এখানেই ইতি টানছি। ওয়াসসালাম।

আলী হাসান উসামা
alihasanosama.com

আমার নাম সুব্রত রায়হান। আমার এই নাম রেখেছিলেন আমার বাবা। এই নামটা অবশ্য আমার কাগজে-কলমের নাম। বাবা আমাকে কখনোই পুরো নাম ধরে ডাকেননি। বাবা ডাকতেন 'সুবোধ' বলে। তিন অক্ষরের সুবোধ। আমাকে নিয়ে বাবার স্বপ্নটা ছিল অন্যরকম। মানুষের বাবারা স্বপ্ন দেখেন তাদের ছেলে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে, আমার বাবা স্বপ্ন দেখতেন আমাকে মহাপুরুষ বানাবেন।

বাবার ধারণা ছিল ছেলে-মেয়েদের যেভাবে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানো যায়, ঠিক সেভাবেই মহাপুরুষ হিসেবেও গড়ে তোলা যায়। আমার শৈশব কেটেছে তাই মহাপুরুষ হওয়ার বিভিন্ন কলাকৌশল আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে। মা মারা যাওয়ায় আমাকে মহাপুরুষ বানানোর জন্যে বাবার এই নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাধা দেয়ার কেউই ছিল না। বাবা আর আমার সংসারে আমি ছিলাম বাবার আদরের গিনিপিগ।

আমি শৈশব পার করলাম, কিশোর হলাম, তারপর তরুণ থেকে যুবা। বাবা মারা গেলেন। কিন্তু মহাপুরুষ হওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকল। গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি গায়ে জড়িয়ে খালি পায়ে পিচ-ঢালা রাস্তা দিয়ে হাঁটা, জোছনা রাতে হাঁ করে জোছনা গেলা। এগুলো সবই আমার মহাপুরুষ হওয়ার প্রক্রিয়ার অংশ। বাবা তাঁর মৃত্যুর আগে আমার হাতে একটি ডাইরি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পড়তে বলেছিলেন। সেটাকে অবশ্য ডাইরি না বলে উপদেশনামা বলা ভালো। জীবনে আরো নানা উপদেশ তিনি আমার জন্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সেই ডাইরীতে। এই উপদেশনামার একটি উপদেশ ছিল এ রকম :

"প্রিয় সুবোধ,

তুমি যখন এই উপদেশগুলি পড়িতেছ, তখন আমি আর নাই। যতদিন আমি ছিলাম তোমাকে নিজে থাকিয়া পথ দেখাইয়াছি, কিন্তু এখন আর উহা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তোমার জন্যে এই উপদেশনামাটি রাখিয়া গেলাম। কখনো যদি কোনো সমস্যা তোমার সামনে আসিয়া পড়ে, তখন এই উপদেশনামা খুলিয়া দেখিবা।

তোমার জন্যে আমার প্রথম উপদেশ এখন আমি বলিব। স্মরণ রাখিও এই জগৎ খুবই ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং ইহার মায়ায় কখনোই নিজেকে জড়াইবা না। হাঁসের মতো হইবা, জগতের মায়ায় ডুব দিবা ঠিক, শরীরে মায়া মাখিবা না। আশা করিতেছি এতদিনে তুমি বুঝিয়া গিয়াছ যে, কোনো কিছুই উদ্দেশ্য ছাড়া হয় না। এই পৃথিবীতে তুমি যে আসিয়াছ, ইহারও কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তোমার কাজ হইল সেই উদ্দেশ্যটি খুঁজিয়া বাহির করা। নিজেকে সব সময় প্রশ্ন করিবা, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবা? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহার উপর নিজের জীবন পরিচালনা করাই হইবে তোমার লক্ষ্য। আমি তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছি এবং মৃত্যুর পরও এই উপদেশনামা দ্বারা সাহায্য করিব। কিন্তু তোমাকে কোনো পথ বাতলাইয়া দিব না। পথ তোমার নিজেরই খুঁজিয়া লইতে হইবে। মহাপুরুষ হইতে হইলে এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা এবং উহার উপর চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই তুমি যখন এই ধরণি ত্যাগ করিবা তখন তুমি মহাপুরুষ হইয়াই ধরণি ত্যাগ করিবা। সবার সন্তান ডাক্তার হয়, ইঞ্জিনিয়ার হয়, চোর হয়, ডাকাত হয়— তুমি হইবা মহাপুরুষ।"

ইতি তোমার বাবা

আমি মহাপুরুষ হতে পেরেছি কি না জানি না, তবে কুরআন পড়ার পর আব্দুল্লাহ হয়ে গেছি। 'আব্দুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর গোলাম। সুবোধ থেকে আব্দুল্লাহ হওয়ার এই প্রক্রিয়াটি জটিল কোনো প্রক্রিয়া নয়। প্রথম প্রথম আমার পরিবর্তনগুলো আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখত; পরে মানিয়ে নিয়েছে। এখন সবাই আমাকে 'আব্দুল্লাহ' নামেই ডাকে।

রাত দুটা বাজে। আমার কাছে এটা তেমন কোনো গভীর রাত না। বলা যেতে পারে রাতের শুরু হয়েছে মাত্র। কিন্তু ঢাকা শহরের মানুষগুলো আমার মতো রাত জাগে না। রাত দুটা তাদের কাছে গভীর রাত। বেশির ভাগ মানুষই শুয়ে পড়েছে। যাদের সামনে SSC, HSC পরীক্ষা তারা বই সামনে নিয়ে ঝিমুচ্ছে। আর কিছু যুবক-যুবতি কম্পিউটারের দিকে দুচোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ফেইসবুকিং করছে।

আমি হাঁটছি। বলা যেতে পারে একরকম হনহন করেই হাঁটছি। গভীর রাতে মানুষজন সব সময়ই কিছুটা দ্রুত হাঁটে। এমনিতে যাদের হাঁটার গতি কিছুটা মন্থর তারাও গভীর রাতে হনহন করেই হাঁটে। পশুদের ব্যাপারটা ভিন্ন। রাতে তারা হাঁটে মন্থর গতিতে। তবে আমার এই হনহন করে হাঁটার পেছনে বিশেষ কারণ আছে। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাজ্জুত নামাযে নাকি এক রাকাতে দাঁড়িয়ে এত বড় তেলাওয়াত করতেন যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিতেন। আজ আমিও তা-ই চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম। বড় সূরাগুলো এখনো ভালোমতো আয়ত্ত করতে পারিনি। আমার মুখস্থ আছে ৯১ নম্বর সূরা থেকে শুরু করে ১১৪ নম্বর সূরা পর্যন্ত। এই সূরাগুলো দিয়েই মাসজিদের বারান্দায় নামায শুরু করে দিলাম। টার্গেট ছিল এত ধীরে এবং কন্সেনট্রেশন দিয়ে আজকে দু-রাকাত তাহাজ্জুতের নামায আদায় করব যাতে মিনিমাম এক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। আমি যখন নামায শুরু করলাম তখন রাত একটা চল্লিশ। বেশ ধীরগতিতে নামায শেষ করে মাসজিদের বারান্দার দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দুটা বাজে মাত্র। এত ধীরে নামায আদায় করার পরও সময় লাগল মাত্র বিশ মিনিট। ঠিক তখন বুঝতে পারলাম আমার খিদে পেয়েছে। প্রচণ্ড খিদে। আমি বেরিয়ে পড়লাম। ভাত খেতে ইচ্ছে করছে। এখন খুঁজলে কিছু রেস্তোরাঁ খোলা পাওয়া যাবে। শক্ত শক্ত হয়ে যাওয়া ভাত, টক হয়ে যাওয়া কাচ্চি হয়তো-বা পাওয়া যাবে। তবে খেতে হবে নগদ টাকায়। এত গভীর রাতে কাস্টমারদের কোনো হোটেলওয়ালা বিনে পয়সায় খাওয়ায় না। এইখানেই আমার সমস্যা। এবং সমস্যা বেশ জটিল। সমস্যাটা হচ্ছে— আমার গায়ে যে জোব্বাটা আছে তাতে কোনো পকেট নেই। পকেটবিহীন এই জোব্বাটা আইশার বাবা আমায় কিনে দিয়েছেন। বেশ দৃষ্টিনন্দন জিনিস। গোলগলা, গলার কাছে সুতোর দারুণ কাজও আছে। সমস্যা একটাই—এই জোব্বাটার কোনো পকেট নেই। ইতিপূর্বে জোব্বাটার এই ত্রুটির দিকে আইশার বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি বললেন, 'পকেটের তোমার আবার দরকার কী বলো তো?'

মুরুব্বিদের প্রায় সব যুক্তিই আমার কাছে খুব কঠিন যুক্তি বলে মনে হয়। কাজেই

আমিও বললাম তাই তো, পকেটের আবার দরকার কী!

আইশার বাবা তির্যক হেসে বললেন, 'তুমি তো সেই নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবিদের (রা) প্রাচীন জামানার ইসলাম পালন করতে চাও। তা তাঁরা যে জোব্বা পড়তেন তাতে কি পকেট থাকত?'

আইশার বাবা কথাটা বলেছেন বিদ্রুপের সুরে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই আমি জানি না। আসলেই তো? নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবিরা যে পোশাক পড়তেন তাতে কি আমাদের মতো এ রকম পকেটের ব্যবস্থা ছিল? আমি মুরুব্বির কথার বিপরীতে কিছু বললাম না। শুধু চোখে এর উত্তর জানি না এমন ভঙ্গিমা এনে ক্যাবলা মার্কা একটা হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে, পকেট না থাকলেও জোব্বাটা আমার বেশ মনে ধরেছে। আমি খুশি খুশি ভাব এনে পকেটবিহীন জোব্বাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছি। তারপর মুরুব্বির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হয়ে গেছি। আর তারপর থেকেই না খেয়ে আছি। যখন পকেটে টাকা থাকে তখন অনেক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়। তারা চা খাওয়ায়, সিঙ্গারা খাওয়ায়, কেউ কেউ ভাত-গোশত-মাছ খাওয়াতে পীড়াপীড়ি করে। তবে আজ যেহেতু পকেট নেই এবং টাকা নেই, কাজেই পরিচিত কারও সাথে দেখাও হয়নি। বুঝতে পেরেছি এ হলো আল্লাহর পরীক্ষা। ধৈর্য ধরতে হবে। কেননা, ধৈর্যশীলদের আল্লাহ পছন্দ করেন।

আমি এখন অবশ্য ভাত খেতে ছোট ফুপার বাসায় যেতে পারি। রাত সোয়া দুটার দিকে কলিং বেল টিপে তাদের ঘুম ভাঙালে কী পরিস্থিতি তৈরি হবে তা আগেভাগে আঁচ করা মুশকিল। ছোট ফুপার বাড়িতে আমার পদচারণা বর্তমানে নিষিদ্ধ আছে। হুজুর হওয়ার পর থেকেই ছোট ফুপা তার বাড়িতে আমার যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি কিছুদিন পর পরই আমাকে তার বাড়িতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই মুহূর্তে আমি ছোট ফুপার বাড়ির নিষিদ্ধজন। কাজেই আমাকে দেখে তিনি খুব আনন্দিত হবেন এই ধরনের ধারণা করা অলীক কল্পনা। সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ যে তিনি বাড়ির দরজা খুললেও গ্রিল খুলবেন না। গ্রিলের আড়াল থেকে হুংকার দেবেন গেট আউট। গেট আউট। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গেট আউট... না হয় বন্দুক বের করব। বন্দুক বের করা তার কথার কথা না। ঢাকার এডিশনাল আইজি তার বন্ধু মানুষ। তাকে দিয়ে তিনি সম্প্রতি বন্দুকের একটা লাইসেন্স করিয়েছেন এবং একটা দোনালা রাইফেল কিনেছেন। বন্দুক কিনেই এডিশনাল আইজি বন্ধুকে সাথে নিয়ে পাখি শিকারের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু বন্দুক হাতে ফুপা কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেই উত্তেজনায় তার বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে যায়। তাই পাখি শিকারের এই

পরিকল্পনা অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রেখেছেন। সেই দোনালা বন্দুক তার এখনো ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। পাখি শিকার না করতে পারলে কি হয়েছে, তিনি বেশ আগ্রহ নিয়েই দোনালা বন্দুক চালানোর সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

এরপর আর বাকি থাকে—জাহানারা ফুপু। 'সূর্যের চেয়ে বালি গরম' এর মতো। ছোট ফুপার চেয়ে তিনি আরও বেশি গরম। ঢাকার এডিশনাল আইজির সাথে তার বন্ধুত্ব থাকলে তিনি একটা একে ফর্টি সেভেন এর লাইসেন্স নিয়ে ফেলতেন। এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।

তবে ভরসার কথা—আজ বৃহস্পতিবার। দেওয়ানবাগীর মুরিদ ছোট ফুপা প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে আয়োজন করে খানিক জিকির-আজকার করেন। খুব আগ্রহ নিয়ে করেন। কিন্তু ডাক্তারের দেয়া পাওয়ারফুল ঘুমের ওষুধের কারণে প্রায়ই অল্প কিছুক্ষণ পর ঝিমিয়ে পড়েন। বড় বড় নিশ্বাস নিতে নিতে তখন বিড়বিড় করে জিকির বাদ দিয়ে হিন্দি কাওয়ালি গানের সুর ধরেন। এত রাতে কলিং বেলের শব্দ শুনলে তারা কেউ দরজা খুলতে আসবে না। আসবে অভি এবং সে একবার দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে ফেললে আর কোনো সমস্যা হবার কথা না।

ছোট ফুপার বাড়ির কাছাকাছি এসেই টহল পুলিশের মুখোমুখি হয়ে গেলাম। ইদানীং টহল পুলিশদের গাড়ি দেয়া হয় টহল দেয়ার জন্যে, কিন্তু এদের কাছে গাড়ি নেই। এরা হেঁটে হেঁটে টহল দিচ্ছে। দলে তারা চার জন। আগে দুজন দুজন করে টহলে বেরুত। ইদানীং টেররিস্ট আতঙ্ক এত বেড়েছে, বোধ হয় দুজন করে বের হতে সাহস পাচ্ছে না... চার জন করে বের হচ্ছে। আমাকে দেখেই তারা থমকে দাঁড়াল এবং এমন ভঙ্গি করল যেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেররিস্টকে এইমাত্র গলির মুখে খুঁজে পাওয়া গেছে। দলের একজন, বোধ করি সবচেয়ে ভিতুজন—কারণ ভিতুরাই বেশি চেঁচিয়ে কথা বলে—চেঁচিয়ে বলল, কে যায়রে? পরিচয় কী?

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং অত্যন্ত বিনয়ের ভঙ্গিতে বললাম, আসসালামু আলাইকুম। আমি আব্দুল্লাহ। আপনারা কেমন আছেন? ভালো?

পুলিশের পুরো দলটাই হকচকিয়ে গেল। পুলিশ-আর্মি এদের সমস্যা হচ্ছে—বেজায়গায় কুশল জিজ্ঞেস করলেই এরা ভড়কে যায়। যেকোনো ভড়কে যাওয়া প্রাণীর চেষ্টা থাকে অন্যকে ভড়কে দেয়ার। কাজেই পুলিশদের একজন আমার দিকে রাইফেল তাক করে কর্কশ গলায় বলল, পকেটে কী?

আমি আগের চেয়ে বিনয়ী গলায় বললাম, আমার কোনো পকেটই নেই।

ফাজলামি করিস? হারামজাদা! থাবড়া দিয়া দাঁত ফালাইয়া দিমু।

দাঁত ফেলবেন ভালো কথা। পুলিশ এবং দন্ত-চিকিৎসকরাই তো দাঁত ফেলবে... এরা ফেলবে না তো কে ফেলবে। নাপিত এসে তো আর দাঁত ফেলবে না, নাপিত ফেলবে চুল। তবে দাঁত ফেলার আগে দয়া করে একটু পরীক্ষা করে দেখুন। সত্যিই আমার পকেট নেই।

এক জন পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এল। সারা শরীর হাতিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গীদের বলল—ওস্তাদ এই বেটার শইল্যে তো আসলেই পকেট নাই।

শইল্যে আমার পকেট কীভাবে থাকবে? আমি তো ক্যাংগারু না, আমি মানুষ। Homosepience। ক্যাংগারুরা বাচ্চা পকেটে নিয়া ঘুরে, আমরা ঘুরি কোলে নিয়া।

ওস্তাদ পকেট ছাড়া জোব্বা পইরা বহুত পট পট করতেসে, একটা টিপা দিয়া দিমুনি?

যাকে ওস্তাদ বলা হচ্ছে সে সম্ভবত দলের প্রধান এবং সবচেয়ে জ্ঞানী। সে বলল, এইডা তো রিজেক্টেড জোব্বা। এই বেকুব, সস্তায় কিনা পকেট ছাড়া জোব্বা পইরা ঘুরতাছস। এই চল, থানায় চল।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম—জি চলুন। আপনারা কোন থানার আন্ডারে? শের-এ-বাংলা নগর থানা?

পুলিশের দলটা বিস্মিত হয়ে গেল। থানায় যাবার ব্যাপারে আমার মতো আগ্রহী কোনো টেররিস্ট তারা বোধ হয় ইতিপূর্বে খুব বেশি পায়নি।

কী নাম বললি?

আব্দুল্লাহ।

কই যাস?

ভাত খেতে যাই।

রাত দুইটায় ভাত খাইতে যাস?

স্যার ভাত তো সব সময়ই খাওয়া যায়। সময় এখানে মুখ্য বিষয় না।

ওস্তাদ যাকে বলা হচ্ছে সেই ওস্তাদ এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, বাদ দেন। পীর-ফকিরের মুরিদ মনে হয়। দুইডা থাবড়া দিয়া চইলা আসেন।

ওস্তাদের মনে হয় সে রকমই ইচ্ছা। ব্যাট দিয়া ছয় মারার আনন্দ আর গালে থাবড়া মারার আনন্দ বোধ হয় কাছাকাছি। টহল পুলিশের ওস্তাদ এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে কেন?

জোরালো একটা থাবড়া খেলাম। চোখে অন্ধকার দেখার মতো থাবড়া। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। 'আল্লাহু আকবার' বলে চিৎকার দিতে গিয়েও দিলাম না। এদের আর ভড়কে দিয়ে লাভ নেই। ওস্তাদ থাবড়া দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমি আন্তরিকভাবে বললাম, আরেকটা থাবড়া দিয়ে যান, শুনেছি এক থাবড়া খেলে নাকি বিয়েশাদি হয় না—যদিও ইসলামে এসব কথার ভিত্তি নেই। তারপরও একটা যখন দিয়েছেন, আরেকটা কষ্ট করে দিয়ে যান। আধুরা কাজ রাখবেন কেন!

পুলিশের দল থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, চইলা আসেন।

স্পষ্টতই ওরা ঘাবড়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেছেন ওস্তাদ। আমি বললাম, নিরীহ মানুষকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে চলে যাবেন—এটা কেমন কথা।

ওস্তাদ দলের কাছে চলে যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি তার পেছনে পেছনে। যদিও উল্টো দিকে যাওয়াই সমীচীন। পুলিশের দল যেন কিছুই হয়নি এ ভঙ্গিতে হাঁটা শুরু করেছে। আমি ওদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছি। আমি শিওর এখন তারা তাদের টহলের গাড়িটাকে দারুণ মিস করছে। তারা আমার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রাস্তা ক্রস করল। আমিও রাস্তা ক্রস করলাম।

এই, তুই চাস কী?

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আরেকটা থাপ্পড় দিয়ে দিন বাসায় চলে যাই। পুলিশের দল কিছু না বলে আবার হাঁটা শুরু করেছে। আমিও তাদের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। কোনো দলের মধ্যে একজন ভয় পেলে সেই ভয় সবার মধ্যে আস্তে আস্তে সঞ্চারিত হয়। এদেরও তা-ই হচ্ছে। এদের মধ্যে ভয়ের চারা বপন করা হয়েছে, যা এখন ডালপালা মেলে বৃক্ষ হচ্ছে। চার জন পুলিশ, দুজনের হাতে রাইফেল। অথচ ওরা এখন আতঙ্কে আধমরা। আমার মজাই লাগছে। আমি একটা আরবি সুরেলা

নাসিদ মনে করার চেষ্টা করলাম। মনে আসছে না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় নাসিদ টাসিদ মাথায় আসতে চায় না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি। আরবি একটা নাসিদ আমি ভালোই গাইতে পারি।... জুন্দুল্লাহ।

নাসিদে টান দেবার কারণে খিদে মনে হয় একটু কমেছে। ছোট ফুপার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুলিশের দল হুট করে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

আমি প্রায় দৌড়ে গলির মুখে গিয়ে বললাম, ভাইজান, আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। ফের মিলেঙ্গে ইনশা-আল্লাহ। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। আমার সামান্য বাক্য দুটোর মর্মার্থ নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে। আজ রাতের টহল তাদের ভালো যাবে না। আজ তারা ভয়ার্ত থাকবে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—ছোট ফুপার বাড়ির প্রতিটি বাতি জ্বলছে। এত রাতেও বাড়ির সব বাতি জ্বলার অর্থ হলো—হয় সে বাড়িতে কারও বিয়ে হচ্ছে, আর না হয় বড় কোনো বিপদ নিশ্চয়ই। মরা বাড়িতেও সব বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। অভি হুট করে এখন বিয়ে করবে বলে মনে হচ্ছে না। বিয়ে বাড়ি আর মরা বাড়ির একটা কমন ব্যাপার হলো, দুটোতেই আত্মীয়-স্বজন গিজগিজ করে। এখানে তেমন মনে হচ্ছে না। আমি এখানে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। কোনো একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি সেই সমস্যায় উপস্থিত হয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলব, 'ভাত খাব'। সেই বলাটাও আরেকটা সমস্যা। আজ বোধ হয় কপালে ভাত নেই। পুলিশের থাপ্পড় খেয়েই রাত পার করতে হবে। আমি কলিং বেলে হাত রাখলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা খুলে গেল। ছোট ফুপা তার ফরসা ছোট-খাটো মুখটা বের করে ভীত চোখে আমার দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, আরে আব্দুল্লাহ! তুই! আয় আয়, ভেতরে আয়। এই শোনো দেখো কে এসেছে? আব্দুল্লাহ এসেছে, আব্দুল্লাহ।

সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছিল সিঁড়ি ভেঙে পরবে। সবাই একসঙ্গে নেমে আসছে। কিছুক্ষণ আগে পুলিশকে ভড়কে দিয়ে এখন নিজেই ভড়কে যাচ্ছি।

গ্রিলের দরজা খুলতে খুলতে ছোট ফুপা বললেন, কেমন আছিসরে?

ফুপার গলায় আমার জন্যে রাজ্যের মায়া। ডাকার সময় যেই মায়া নিয়ে 'রে'তে টান দিলেন তাতে আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসার জোগাড়। একজন 'প্রবেশ নিষেধ' মানুষের জন্যে হঠাৎ এই মায়ার উদ্ভব এর কারণটা না জানা পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি।

কিরে বললি না তো কেমন আছিস?

ভালো আছি ফুপা, আলহামদুলিল্লাহ।

বাড়ির অন্যরাও চলে এসেছে। আঠারো উনিশ বছরের একজন তরুণকে দেখা যাচ্ছে। ছেলেটি এমনভাবে আমাকে দেখছে, যেন আমি আসলে আগ্রার তাজমহল। হেঁটে শের-এ-বাংলা নগর চলে এসেছি।

ফুপা বললেন, হেন জায়গা নেই তোকে খোঁজা হয়নি। কোথায় ছিলি?

আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। নির্বিকার ভঙ্গি ঠিক ফুটল না। আমার জন্যে এই পরিবারটির প্রবল আগ্রহের আসল কারণটা না জানলে সহজ হওয়া যাচ্ছে না। সামথিং ইজ রং, ভেরি রং।

অভি ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ওর কোনো খোঁজ না পেয়ে আমাকে খোঁজা হচ্ছে। আজকাল দাড়ি-টুপিসহ ছেলেপুলেরা তিন দিনের জন্যে তাবলিগে গেলেও বাবা-মায়ের মন আঁকুপাঁকু করতে থাকে—এই আবার টেররিস্ট হয়ে গেল নাকি। অভি দাড়ি রেখেছে। টাখনুর ওপর পায়জামা পরে ঘুরে বেড়ায়। বেশ বড় চুলও রেখেছে। খুব সিরিয়াসলি ইসলাম প্র্যাকটিস করছে। অভির হারিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ আমার মাথায় আসছে না। আমার ইসলাম প্র্যাকটিস শুরু করার পর থেকে অভিও ইসলাম প্র্যাকটিস শুরু করেছে। সুতরাং অভি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে বলেই ধরে নেয়া যায়। এ ছাড়া আমার জন্যে এত ব্যস্ততার দ্বিতীয় কোনো কারণ হতে পারে না। ইসলাম প্র্যাকটিস শুরু করার পর থেকেই আমি এ বাড়ির নিষিদ্ধজন। ইদানীং টেলিভিশনে সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের কারণে এ বাড়ির দরজা আমার জন্য আরও বেশি বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু আমি নিষিদ্ধ নই; আমার ছায়াও এখন এ বাড়িতে নিষিদ্ধ।

আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, অভি কোথায়? অভিকে তো দেখছি না। শুয়ে পড়েছে?

ফুপা-ফুপু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ফুপা বললেন, ও ঘরেই আছে।

শরীর ভালো না? অসুখ করেছে নাকি?

না। আব্দুল্লাহ তুই বস, তোর সঙ্গে কথা আছে। চা-কফি কিছু খাবি?

চা অবশ্যই খাব, তবে ভাত-টাত খেয়ে তারপর খাব। ফুপু, রাতে কী রান্না

করেছেন? রাতের বাড়তি খাবার নিশ্চয়ই ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছেন?

ফুপু গম্ভীর গলায় বললেন, আর রান্না-বান্না! দুদিন ধরে খাবারের কথা চিন্তাও করতে পারছি না।

কেন? কাহিনিটা কী?

ফুপা গলা পরিষ্কার করছেন—যেন অস্বস্তির কোনো কথা বলতে যাচ্ছেন। গলার টানেল পরিষ্কার করে নিতে হচ্ছে।

বুঝলি, আমাদের ওপর দিয়ে বিরাট বিপদ যাচ্ছে। হয়েছে কী, অভি তার বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিল। ওই বিয়ে খেতে গিয়েই কাল হয়েছে। গলায় কাঁটা ফুটেছে।

গরুর রেজালা খেয়ে গলায় হাড় ফুটতে পারে ফুপা। কাঁটা ফুটবে কেন?

আরে বলিস না, কাঁটাই ফুটেছে। বেশি কায়দা করতে গিয়ে ওরা বাঙালি বিয়ের আয়োজন করেছে—মাছ, ভাত, ডাল, দই। ফাজিল আর কি, বেশি বেশি বাঙালিপনা।

অভির গলার সেই কাঁটা এখন আর বেরুচ্ছে না?

না।

ডাক্তার দেখিয়েছেন?

ডাক্তার দেখাব না মানে! বলিস কী? হেন ডাক্তার নেই যাকে দেখানো হয়নি। আজ সকালেও একজন নাক-কান-গলা স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। হাঁ করিয়ে চিমটা ঢুকিয়ে নানা কসরত করেছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক বিভিন্ন কায়দা-কানুনের পর বেচারা হাল ছেড়ে বলেছে কাঁটা অনেক নিচে; চিমটা দিয়ে ধরতে পারছে না। দুদিন ধরে অভি কিছুই খাচ্ছে না। ঘুমোচ্ছে না। কী যে বিপদে পড়েছি!

বিপদ তো বটেই।

তোর ফুপু গোলাপ শাহের মাজার থেকে খাওয়ার গোলাপজল পড়িয়ে এনেছিল। ওটাও খালি পেটে পশ্চিম দিকে মুখ করে গোলাপ শাহ বাবার নামে একনিশ্বাসে খাওয়ানো হয়েছে। কিছুই বাদ নেই।

অভি এই পানি খেয়েছে।

ও যদি জানত তাহলে কি আর মুখে দিত নাকি। কৌশলে খাওয়ানো হয়েছে।

এটা তো শিরক হয়ে গেল...

চিকিৎসা আবার শিরক হয় কীভাবে, তুই এইসব উগ্রতা ছাড় তো, আমরা আছি টেনশনে, সে আসছে শিরক-বিদাত শিক্ষা দিতে।

এটা সম্পূর্ণ শিরক ফুপা। এবং এটা বর্জনীয়। আচ্ছা এ রকম আর কোনো কিছু কি করা হয়েছে?

কী আর বলব তোকে লজ্জার কথা। পীর সাহেবের মুরিদদের মধ্যে আমার এক জাকেরিন ভাই বলেছিল বিড়ালের পায়ে ধরে মাফ চাইলে গলার কাঁটা নেমে যাবে। তার মতে গ্রাম-বাংলার মানুষ গত হাজার হাজার বছর ধরে কাঁটা ফুটলেই বিড়ালের পায়ে ধরছে। কাজেই এর একটা গুরুত্ব আছে। কাঁটা হচ্ছে বিড়ালের খাদ্য। আমরা সেই খাদ্য খেয়ে বিড়ালের প্রতি একটা অবিচার করছি। সে জন্যেই বিড়ালের পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

ছেলের হালত দেখে সে সময় জাকেরিন ভাইয়ের কথাগুলো আমার কাছে বেশ যুক্তিযুক্তই লেগেছে।

ভালো কথা, তাহলে কি অভিকে বিড়ালের পায়েও ধরানো হয়েছে?

ফুপা থমথমে গলায় বলল, বিড়ালের পায়েও ধরানো হয়েছে। সে-ও এক কেলেংকারি কাণ্ড। বিড়াল খামচি দিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছে। এটিএস দিতে হয়েছে। এখন তুই একটা ব্যবস্থা করে দে।

আমি?

ফুপু বলল, হ্। অভির ধারণা, তুই-ই নাকি একটা ব্যবস্থা করতে পারবি। তোর ফুপা ওকে ব্যাংককের বামরুংগ্র্যাড হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। ও তোর সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। হেন জায়গা নেই যে তোর খোঁজ করা হয়নি। তোকে হঠাৎ আসতে দেখে বুকে পানি এসেছে। দুটা দিন গেছে, ছেলে একটা কিছুও মুখে দেয়নি। আরও কয়েকটা দিন এ রকম গেলে তো ও মরে যাবে।

ফুপুর কথা শেষ হবার আগেই অভি ঘরে ঢুকল। চুল উষ্কখুষ্কু, চোখ বসে গেছে। ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছে না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, খবর কিরে?

অভি ফ্যাকাশে ভঙ্গিতে হাসল। সাহিত্যের ভাষায় এই হাসির নাম করুণ হাসি।

আমি বললাম, কিরে, শেষ পর্যন্ত মাছের হাতে পরাজিত?

অভি তার মুখ আরও করুণ করে ফেলল। বসে থাক, আল্লাহ নিশ্চয়ই উত্তম ব্যবস্থা করবেন। আমি আগে গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করে নিই, তারপর তোর সমস্যা ট্যাকেল করব ইনশা-আল্লাহ।

অভির মুখ মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে গেল। পাশের সেই তরুণ ছেলেটির ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গ হাসির আভাস। তবে সে কিছু বলল না। এ বাড়ির পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আমার অনুকূলে। এ রকম অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ না করা নিতান্তই বোকামি হবে। আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, গোসল করব। ফুপু, আপনার বাথরুমে হট ওয়াটারের ব্যবস্থা আছে না?

গিজার নষ্ট হয়ে গেছে। যা হোক, পানি গরম করে দিচ্ছি। গোসল করে ফেল। গোসল করে ভাত খাবি তো?

হু।

তাহলে ভাত-টাত যা আছে গরম করতে দিই।

ঘরে কি পোলাওয়ের চাল আছে?

আছে।

তাহলে চট করে পোলাওয়ের চাল চড়িয়ে দিন। নতুন আলু নিশ্চয়ই আছে। নতুন আলু ভালো করে ভাজা খেতে দারুণ স্বাদ। কুচি কুচি করে আলু কেটে বেশি করে গুঁড়ো মরিচ দিয়ে ডুবা তেলে কড়া করে ভাজা। গরম ভাত, আলুভাজার সঙ্গে এক চামচ গাওয়া ঘি। খেতে এক্সেলেন্ট হবে। গাওয়া ঘি আছে না বাসায়?

ঘি নেই।

মাখন আছে?

হু।

অল্প আঁচে মাখন ফুটাতে থাকেন। গাদ যেটা বের হবে তা ফেলে দেবেন, একেবারে এক নম্বর গাওয়া ঘি তৈরি হবে। কয়েকটা শুকনো মরিচ ভাজলে মন্দ হয় না। ঘিয়ের মধ্যেই ভাজবেন।

অভির কাঁটাটার কিছু করা যায় কিনা দেখ।

দেখব। ইনশা-আল্লাহ, সে দুদিন যখন অপেক্ষা করেছে, আরও ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে পারবে। পারবি নারে অভি?

অভি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়াল। মনে হচ্ছে কথা বলার মতো অবস্থাও তার নেই। আমি গুনগুন করে আবারও সেই নাসিদটা গাইতে চেষ্টা করলাম। তরুণ সেই ছেলেটা আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি যেন কেমন! ভালো মনে হয় না। সে দৃষ্টিতে কৌতূহল আছে। শুদ্ধ কৌতূহল না, অশুদ্ধ কৌতূহল। ছেলেটা বোধ হয় একটা দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে দৃশ্যটি হলো— একজন হুজুর টাইপ মানুষের পরাজিত হয়ে লজ্জা পাওয়ার মজাদার দৃশ্য। পুলিশের মতো এই ছেলেটাকেও ভড়কে দিতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু পারছি না। এ বয়সের ছেলেগুলো এত সহজে ভড়কায় না। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার নাম কী?

ইরাম।

শোনো ইরাম, তোমার যদি কোনো কাঁটার ব্যাপার থাকে, গলায় কাঁটা বা হৃদয়ে কাঁটা, আমাকে বলো। তোমার কাঁটারও একটা ব্যবস্থা করা যায় নাকি দেখি।

ইরাম কঠিন ভঙ্গিতে বলল আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি গোসল করতে যান, আপনাকে গরম পানি দেয়া হয়েছে।

কীভাবে সম্ভব। এত ঝটপট তো পানি গরম হওয়ার কথা না।

খাওয়ার জন্যে পানি ফুটানো হয়েছে, ওই পানিই দেয়া হয়েছে।

জাযাকাল্লাহু খাইর, মেনি থ্যাংকস।

আমি খেতে বসেছি। চেয়ারে বসেই অভিকে ডাকলাম, অভি খেতে আয়। অভির জন্যে একটা প্লেট দেখি।

ফুপা বললেন, ও তো ঢোকই গিলতে পারছে না। ভাত খাবে কী? তুই তো ওর

ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিস না।

আমি ফুপাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডাকলাম, অভি আয়।

অভি উঠে এল। আমার আদেশ অগ্রাহ্য করা অন্য সবার পক্ষে সম্ভব হলেও অভির পক্ষে সম্ভব না। আমি অন্য সবাইকে সরে যেতে বললাম।

শোন অভি, এখন ঘরে যা, ভালো করে ওজু করবি, তারপর দু-রাকাত নফল নামায পড়বি। নামায শেষ করে আল্লাহর কাছে তোর এই দুর্দশার কথা খুলে বলবি। যদিও তিনি জানেন, তারপরও ভালো করে তাঁর কাছে চাইতে হবে। ভিক্ষুকের মতো করে চাইতে হবে। কান্নাকাটি করা ভিখারির জন্যে তো মানুষেরই দয়া হয়। আর আল্লাহ তো দয়ার সাগর। দেখবি অবশ্যই আল্লাহ সহজ করে দেবেন। তাড়াতাড়ি যা, তুই এলে তোকে নিয়ে খাওয়া শুরু করব। দারুণ খিদে পেয়েছে।

অভি ধীরপায়ে তার ঘরে চলে গেল। আমি কোথায় যেন গলার কাঁটা দূর করার একটা দোয়া দেখেছিলাম। খুব সম্ভবত সূরা ওয়াকিয়াহর একটা আয়াত পড়ে আগে মানুষ গলায় কাঁটা বিঁধলে ঝাড়ত। কিন্তু গলায় কাঁটা বিঁধলে এ আমলটি কতটুকু সহিহ তা জানি না। এর কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল আছে কি না তা-ও আমার জানা নেই। তাই সহজ বুদ্ধিতে দু-রাকাত নফল নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে বলাটাকেই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হলো। আমিও গোসল সেরে দু-রাকাত নফল আদায় করে আল্লাহর কাছে বলেছি। দেখা যাক, আল্লাহ তাকদিরে কী রেখেছেন।

অল্প সময় পরই অভি চলে এল।

অভি শোন, তোর পেটে খিদে, তুই বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর। গলায় ব্যথা করে—করুক। কিছু যায় আসে না। আপাতত কিছু সময়ের জন্যে গলাটাকে পাত্তা দিবি না। আল্লাহর ওপর ভরসা কর। তাঁকে যেহেতু বলেছিস, আশা করি তিনি অবশ্যই ঠিক করে দেবেন। কাঁটা থাকুক কাঁটার মতো, তুই থাকবি তোর মতো। বুঝতে পেরেছিস?

হু।

আরাম করে দুই ভাই একসঙ্গে ভাত খাব। ভাত খওয়ার পর আমরা মিষ্টি পান খাব। জর্দা ছাড়া। তারপর দেখি তোর কাঁটার কী করা যায়।

আব্দুল্লাহ ভাই, খাওয়ার আগে কাঁটার কিছু একটা ব্যবস্থা করলে হয় না?

হয়। আগে করলেও হয়, তাতে কাঁটাটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। আমরা ফুলকে গুরুত্ব দেবো। কাঁটাকে না। ঠিক না?

ঠিক।

আয় খাওয়া শুরু করা যাক। অভি ভাত মাখছে। আমি বললাম, 'বিসমিল্লাহ' বলেছিস?

অভি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়াল।

শুকনো মরিচ ভালো করে ডলে নে—ঝালের চোটে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে পানি না বের হলে ঝাল খাওয়ার মজা কী। শুরু করা যাক...

বিসমিল্লাহ...

অভি খাওয়া শুরু করল। কয়েক লোকমা খেয়েই হতভম্ব গলায় বলল— আব্দুল্লাহ ভাই, কাঁটা চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে!

'চলে গেলে গেছে। এতে আকাশ থেকে পড়ার কী আছে? আল্লাহকে বলেছিলি, আল্লাহ তোর দোয়া কবুল করেছেন। বল, আলহামদুলিল্লাহ।

অভি বলল, আলহামদুলিল্লাহ।

এখন খাওয়া শেষ কর।

বাসার সবাইকে আগে খবরটা দিয়ে আসি।

এটা এমন কোনো বড় খবর না যে, মাইক বাজিয়ে শহরে ঘোষণা দিতে হবে। আরাম করে খা তো। আলুভাজিটা অসাধারণ হয়েছে না?

অমৃতভাজির মতো লাগছে।

ঘি দিয়ে চপচপ করে খা—ভালো লাগবে।

আজ তুমি না এলে আমি হয়তো মরেই যেতাম। আমি সবাইকে বলেছি আব্দুল্লাহ ভাই-ই কেবল পারে এই কাঁটা দূর করতে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি।

শোন অভি, আব্দুল্লাহ ভাই কিচ্ছু পারে না। যা করেন আল্লাহই করেন। 'আমি না



এলে তুই মরে যেতি' এভাবে আর বলবি না—এটা শিরক হয়ে যায়, বুঝলি।

জি।

ইরাম তো তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি যখন বললাম আব্দুল্লাহ ভাই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। আর তাই হয়তো আল্লাহ তার দুয়া কবুল করেন। তখন হাসতে হাসতে সে প্রায় বিষম খায়। আজ সে সত্য বুঝবে ঠিকই, আজ তার একটা শিক্ষা হবে।

অভির চোখ ভিজে গেছে। ঝালের কারণে পানি এল, না আনন্দের পানি সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

আল্লাহর দারুণ এক সৃষ্টি মানুষের চোখের এই পানি। দুঃখ, বেদনা, আনন্দ সবকিছু প্রকাশের অদ্ভুত সুন্দর এক মাধ্যম এই চোখের পানি।



কাঁটামুক্তির যে আনন্দ এই বাড়িতে শুরু হলো তার কাছে বিয়ে বাড়ির আনন্দ কিছুই না। ফুপু ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করলেন। অভি যতই বলে কী যন্ত্রণা মা, আমাকে ছেড়ে দাও তো। তিনি ততই শক্ত করে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন।

ফুপা আনন্দের চোটে পীরবাবার দেয়া বিশেষ জিকিরে বসতে যাচ্ছেন। আজ বৃহস্পতিবার। এমনিতেই তার জিকিরের দিন। ছেলের সমস্যার জন্যে ঠিকমতো বসতে পারছিলেন না। আজ সে মনে হয় সিদ্ধি টেনে বসবেন। সিদ্ধি অর্থাৎ গাঁজা। ডাক্তারের যে ওষুধ ফুপা জিকিরের আগে খান সেটা আসলে তার ঝিমুনি আনে না। ঝিমুনি আনে সিদ্ধি। সিদ্ধি টানলে নাকি জিকিরের সময় পীরবাবার দিদার হয়। জিকির হয় এক শতে এক শ। ফুপা আজ সিদ্ধি টানবেন। বেশ আয়েশ করেই টানবেন।

ফুপা যে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, সংস্কৃত কবিরা সেই দৃষ্টিকে বলেন প্রেমনয়ন। শুধু ইরামের চোখ কঠিন। পাথরের চোখেও সামান্য তরল ভাব থাকে, তার চোখে তাও নেই। ক্লিন শেভ্ড ছেলেদের এমন কঠিন দৃষ্টি মানায় না। কেমন যেন মেয়ে মেয়ে লাগে... অস্বস্তিকর।

রাতে ফুপার বাড়িতে থেকে গেলাম। আজ আমার থাকার জায়গা হলো গেস্ট রুমে। এই বাড়ির গেস্ট রুম তালাবদ্ধ থাকে। ভিআইপি গেস্ট এলেই শুধু তালা খোলা হয়, না হয় সাধারণ অতিথিদের জায়গা হয় বসার ঘরের পাশে একটা ছোট্ট ঘর আছে সিঙ্গেল চকি পাতা, সেই ঘরে। আমার জন্যে গেস্ট রুমের দরজা খোলা হয়েছে এবং এই বাড়িতে আমার প্রবেশের ওপর আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা আপাতত উইথড্র করা হয়েছে। অভির কণ্টকমুক্তিতে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দেয়া হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। ঘুমুতে যাবার আগে আগে আমার জন্যে কফি চলে এল। এটিও বিশেষ ব্যবস্থার একটা অংশ। কফি নিয়ে এল ইরাম। ইরাম সম্পর্কে এ পর্যন্ত তথ্য যা

সংগ্রহ করেছি তা হচ্ছে—ছেলেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থেকে পড়াশোনা করে। কিছুটা নাস্তিক গোছের। কিছুটা না; পুরোপুরি আপাদমস্তক নাস্তিক গোছের। সামনে তার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। হলে পড়াশোনার সমস্যা হচ্ছে, তাই এ বাড়িতে চলে এসেছে। ফুপার খালাতো ভাইয়ের বড় ছেলে। দারুণ নাকি ব্রিলিয়ান্ট। না পড়লেও নাকি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে। তারপরেও পড়ছে, কারণ রেকর্ড মার্ক পেতে চায়।

ইরাম কফির কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আপনার ধারণা আজ আপনি আপনার বিশেষ এক অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেন?

আমি কফির কাপে বিসমিল্লাহ বলে চুমুক দিতে দিতে বললাম, তোমার কি এ রকম ধারণা?

অবশ্যই না। অভি আপনাকে এবং আপনাদের আল্লাহকে অগাধ বিশ্বাস করে। তাই আপনাকে দেখে সে রিল্যাক্সড বোধ করেছে। সহজ হয়েছে। ভয়ে আতঙ্কে তার গলার মাংসপেশি শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাবও দূর হয়েছে। তারপর আপনি তাকে ভাত খাওয়ালেন, সহজেই কাঁটা বের হয়ে এল। আমি কি ভুল বলছি?

না, আমার ক্ষমতা সম্পর্কে ভুল বলোনি। তবে আল্লাহ সম্পর্কে তোমার ধারণা খুবই ভুল।

আল্লাহর ব্যাপার নিয়ে আমি আপনার সাথে এখন কথা বলতে চাচ্ছি না। আপনার ব্যাপারটাই বলতে চাই। আপনি নিতান্তই লৌকিক একটা ব্যাপার করে সেটাকে অলৌকিক ফ্লেভার দিয়ে ফেলেছেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে?

আমি কোনো ফ্লেভার দিইনি ইরাম। এটা তুমি কল্পনা করছ।

আপনি না দিলেও অন্যরা দিচ্ছে, অভি দিচ্ছে। আপনার ফুপা-ফুপু দিচ্ছেন।

তাই নাকি!

ইরাম কঠিন গলায় বলল, আমাদের সমাজে কিছু কিছু প্রতারক আছে, যারা হাত দেখে গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে পাথর দেয়, মন্ত্রতন্ত্র পড়ে। আপনি কি তাদের চেয়ে আলাদা? আপনি আলাদা নন, আপনি তাদের মতোই একজন।

হতে পারে। কিন্তু তুমি আমাদের ওপর আল্লাহর করুণাকে ভুলভাবে দেখছ। বলা যায়, ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছ। আর বাই দ্যা ওয়ে আমার ওপর এত রেগে আছো কেন

তুমি?

আপনি যে শুরু থেকেই আমাকে তুমি তুমি করে বলছেন সেটাও আমার খারাপ লাগছে। আমি তো স্কুলে পড়া বাচ্চাছেলে না। আপনি আমাকে চেনেনও না। প্রথম দেখাতেই আপনি আমাকে তুমি বললেন কেন?

ভুল হয়েছে। তবে একবার যখন বলে ফেলেছি সেটাই বহাল রাখি। মানুষ আপনি থেকে তুমিতে যায়। তুমি থেকে আপনিতে যায় না। নিয়ম ভাঙা কি ঠিক হবে?

আমার বেলায় নিয়মটা ভাঙলেই আমি খুশি হব।

ঠিক আছে, তাহলে এখন থেকে আপনি করেই বলব।

ধন্যবাদ। আরেকটা কাজ কি দয়া করে করবেন?

অবশ্যই করব ইনশা-আল্লাহ, বলুন।

অভিকে ডেকে একটু কি বুঝিয়ে বলবেন তার গলার কাঁটাটা কীভাবে গেল? ওর মন থেকে ভৌতিক ব্যাপারগুলো দূর করা দরকার। আপনি বুঝিয়ে বলে দিন। আমার বলায় সে কনভিন্সড হবে না।

ডেকে নিয়ে আসুন, যা সত্য আমি তা-ই বলে দেবো ইনশা-আল্লাহ।

ইরাম অভিকে নিয়ে ঢুকল। আমি বললাম, অভি তুই স্থির হয়ে আমার সামনের চেয়ারটায় বস। ইরাম, আপনিও বসুন। তবে আপনাকে স্থির হয়ে না বসলেও চলবে; আপনি ইচ্ছে করলে নড়াচড়া করতে পারেন।

ইরাম তাকাচ্ছে তীব্র চোখে। আমি তার সেই চোখ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অভির দিকে তাকিয়ে বললাম—অভি শোন, তুই যদি ভেবে থাকিস আমি আমার মহান ক্ষমতাবলে তোর গলার কাঁটা গলিয়ে ফেলেছি, তাহলে তুই বোকার স্বর্গে বাস করছিস। তোর এই কাঁটা যাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনোই ক্রেডিট নেই। সবই আল্লাহর ইচ্ছা বুঝলি। আল্লাহ তাঁর করুণা দিয়ে তোকে সাহায্য করেছেন। বল আলহামদুলিল্লাহ...

অভি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আলহামদুলিল্লাহ।

আর শোন, তোর কাঁটা যাওয়ার বস্তুগত যে এক্সপ্লেনেশনটা আছে সেটা ইরাম

খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে তোকে বুঝিয়ে দেবেন। তুই তার কাছ থেকে ব্যাপারটা পুরোপুরি জেনে নিস। ব্যাখ্যা শুনে তারপর ঘুমোতে যাবি, তার আগে না। মনে থাকবে?

থাকবে।

যা ভাগ।

অভি হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইরাম এখনো তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে, সে খুব অপমানিত বোধ করছে। ছেলেটাকে খেয়াল করে দেখলাম, সুদর্শন ছেলে। এ রকম একটা ছেলে ফিজিক্স পড়ছে দেখে ভালো লাগল। আজকাল তো ছেলে-মেয়েরা বিবিএ এমবিএ নিয়েই পড়ে থাকে।

আমি চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পরলাম। ফোম বিছানো গদি—আরামের বিছানা। এত আরামের বিছানায় কি ঘুম আসবে? নবিজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মতো ঘুমাতে পারলে খুব ভালো হতো। হাদিসে এসেছে নবিজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চোখ ঘুমাত কিন্তু অন্তর ঘুমাত না। আয়েশা (রা) নবিজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি কি বিতর সালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন? নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমার চোখ ঘুমায়, আমার অন্তর ঘুমায় না। অথচ আমাদের চোখ জেগে থাকলেও অন্তর ঘুমিয়ে থাকে। সে যাই হোক, এখন একটু চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকতে হবে। ফজর পড়তে হবে ঘুম থেকে উঠে। ফ্রেশ হয়ে।

সুবোধ জেগে আছিস?

ফুপার জড়ানো গলা। ইতিমধ্যে তিনি সিদ্ধির টানে বেশ ওপরে উঠে গেছেন। উঁচু তারে নিজেকে বেঁধে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। ফুপাকে ঘরে ঢোকানো এখন বিপজ্জনক হবে। তিনি উঁচু থেকে আরও উঁচুতে চড়তে থাকবেন, তারপর হঠাৎ করে নিচে নামবেন। বমি করে ঘর ভাসাবেন। সিদ্ধি খেয়ে খুব কম মানুষ বমি করে। ওই অল্পসংখ্যক মানুষগুলোর একজন আমার এই ফুপা।

সুবোধ, এই সুবোধ।

জি।

তোর সঙ্গে কিছু গল্প-গুজব করা যাক—ম্যান টু ম্যান টক। তুই আজ ভারি ভেল্কি

দেখালি। দরজা খোল, সুবোধ, এই সুবোধ।

গঞ্জিকার নেশা অনেক বেশি চড়ে গেছে মনে হচ্ছে। আমাকে পর্যন্ত সুবোধ বলে ডাকছে। দরজা না খুলে নিস্তার পাওয়া যাবে না। ঘ্যানঘ্যান করতেই থাকবে। কাজেই দরজা খুললাম। ছোট ফুপার হাতে সিগারেট জ্বলছে। তবে তার গন্ধ বলে দিচ্ছে তামাকের বদলে সেটায় রয়েছে অন্য কিছু। তিনি সেই জিনিস হাতে নিয়েই ঢুকে পড়লেন।

তোর ফুপু ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব টেনশন গেছে তো, এখন আরামে ঘুমোচ্ছে। আমি ভাবলাম 'কণ্টকমুক্তি'টা পীরবাবার নামে একটু সেলিব্রেট করা যাক। কণ্টকমুক্তি শব্দটা কেমন লাগছে?

ভালো লাগছে।

কণ্টকমুক্তির আরবি কী হবে? তুই তো হুজুর মানুষ। বল দেখি?

ফুপা আপনি দ্রুত টানছেন। আমার মনে হয় এখন উচিত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া।

তোর সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। গল্প করতে ভালো লাগছে। আমার ধারণা তোর ওপর ইনজাস্টিস করা হয়েছে। তোকে যে আমি বা তোর ফুপু দেখতে পারি না এটা অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। তোর অপরাধ কী? আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ভেবেছি। তোর নেগেটিভ দিকগুলো কী :

এক. তোর চাকরি-বাকরি নেই। এটা কোনো ব্যাপার না, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাদের চাকরি নেই।

দুই. তুই পথে পথে ঘুরিস। মাঝে মাঝে তাবলিগে যাস, আবার সালাফিদের সাথেও তোকে দেখা যায়। বিভিন্ন হালাকায়ও তুই এটেইন করিস। ওয়াহাবি, দেওবন্দি আলেমরাও নাকি তোকে পছন্দ করে। মিলাদ, ওরস, মাজার, পীর-ফকিরদের রিজেক্ট করিস। কেমন যেন টেররিস্ট টেররিস্ট মনে হয় তোকে।

আর খাবেন না ফুপা।

কথার মাঝখানে কথা বলিস না তো সুবোধ। আমি কী যেন বলছিলাম?

টেররিস্ট সম্পর্কে কী যেন বলছিলেন।

কোন টেররিস্ট? জর্জ বুশ? জর্জ বুশের কথা খামাখা বলব কেন?

আর না টানলে হয় না ফুপা?

হয়। হবে না কেন? তবে আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। জর্জ বুশের কথা কী বলছিলাম?

আমার ঠিক মনে পড়ছে না ফুপা।

হুম।

ফুপা একটা কথা।

কী কথা মাই ডিয়ার।

আমার নাম আব্দুল্লাহ, সুবোধ আর ডাকবেন না।

আচ্ছা ডাকব না।

থ্যাংক ইউ।

শোন সুবোধ আই মিন আব্দুল্লাহ, তুই খারাপ না। তোর একটা ক্ষমতা আছে। অভি যে তোর নাম বলতে অজ্ঞান হয়ে যায়, অভির কোনো দোষ নেই। আই লাইক ইউ আব্দুল্লাহ।

থ্যাংক ইউ ফুপা। তবে আমার কোনোই ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা আল্লাহর। সব তিনিই করেন।

তোর একটাই অপরাধ তুই সবকিছুর মধ্যে ইসলামকে টেনে নিয়ে আসিস। ধর্মকে সব জায়গায় টেনে আনার কী দরকার। অবশ্য টেররিস্ট জর্জ বুশও তো ইসলামকে জোর করে সব জায়গায় টেনে আনত। আচ্ছা, আমি এতক্ষণ ধরে জর্জ বুশকে টেররিস্ট কেন বলছি, কিছুই বুঝতে পারছি না।

ফুপা চোখ-মুখ উল্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর হড়হড় শব্দ হতে লাগল। দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার কিছুই করার নেই। ফুপা বিছানাতে বসেছিলেন; বিছানা এবং আমার শরীরের একাংশে তিনি বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছেন। এখন গা এলিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে কোনো এক হিন্দি কাওয়ালি গাইছেন।

জহুরুল সাহেব বের হচ্ছিলেন। আমাকে দেখে মনে হলো পূর্ণিমার চাঁদ হাতে পেয়ে গেছেন, উচ্ছ্বাসে একরকম চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলেনরে ভাই এতদিন?

জহুরুল সাহেব স্বাস্থ্যে নাদুসনুদুস, এই লোকের মাথা এবং কাঁধ একসাথে লাগানো, গলা বলে যে কিছু আছে সেটা তাকে দেখলে বোঝার উপায় নেই। তার শরীরের মতো তার বুদ্ধিও কিঞ্চিৎ মোটা। মোটা মানুষগুলোর অন্তরও তাদের শরীরের মতোই প্রশস্ত হয়। এটা আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি। জহুরুল সাহেবের অন্তরও বেশ প্রশস্ত আলহামদুলিল্লাহ, এই লোক সহজ সরল এবং এর মনে মায়াভাব প্রবল। আমি ছয়-সাত দিন ধরে মেসে আসছি না। অন্য কেউ এই ব্যাপারটি হয়তো একদম লক্ষই করেনি। তিনি কিন্তু ঠিকই লক্ষ করেছেন। আমাকে দেখে তিনি যে উল্লাসের ভঙ্গি করলেন, এটা কোনো মেকি উল্লাস না। তার এই উল্লাসে কোনো খাদ নেই।

'কোথায় ছিলেন ভাই এতদিন বলুন তো?'

আমি হাসলাম। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর আমি ইদানীং হেসে দেবার চেষ্টা করছি। হালকা করে হাসা ভালো। এটা সুন্নাহ।

হাসি দিয়ে কিন্তু মনের ভাবও প্রকাশ করা যায়। যেমন আমি এখন যেই হাসিটি দিলাম এটার অর্থ হলো আশেপাশেই ছিলাম।

জহুরুল সাহেব বললেন, গত বৃহস্পতিবার মেসে ফিস্ট হলো। বিরাট খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছে ভাই। পোলাও, গরুর রেজালা, মুরগির রোস্ট... এলাহি কাণ্ড। গরুর গোশত আমি নিজে কিনে এনেছিলাম। মাত্র জবাই করা গরু দেখিয়ে বললাম, হাফ আমাকে দাও, কোনো ঝামেলা করবে না।

হাফ দিয়েছিল?

দেবে না মানে? তবে ব্যাটা ছিল ধুরন্ধর। গোশত মাপার আগেই আমার সামনে ছোট করে পিস করতে চায়। আমি বললাম, খবরদার, আগে ওজন করে তারপর ছোট করে পিস করবে।

আগে ছোট করে পিস করলে কী সমস্যা?

কী যে বলেন ভাই! আগে পিস করতে দিলে কি আর উপায় আছে? কিছু বোঝার আগেই ফস করে বাজে গোশত মিক্স করে ফেলবে। ম্যাজিক দেখিয়ে দেবে। গরুর গোশত কিনে নিয়ে রান্না করার পর খেতে গিয়ে বুঝবেন মহিষের গোশত। রবি ঠাকুরের মহেশ না ভাই পুরা মহিষ।

জহুরুল সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা বাড়ির সদর দরজায়, তিনি বেরুচ্ছিলেন। আমাকে দেখে আমার সাথে আবার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেন। আমার পেছনে পেছনে ঘরে এসে ঢুকলেন। ফিস্টের গল্পটা সম্পূর্ণ আমাকে না-বলা পর্যন্ত তিনি শান্তি পাবেন না। গোশত কেনা থেকে যে গল্প শুরু হয়েছে সেই গল্প শেষ হবে খাওয়া কীভাবে হলো সেখানে। আমাকে এখন বড়সড় একটা গল্প শুনতে হবে। সুতরাং আমি ধৈর্য নিয়ে গল্প শোনার প্রস্তুতি নিচ্ছি। খাওয়া-দাওয়ার যেকোনো গল্প বলতে ভদ্রলোকের অসীম আগ্রহ। এত আনন্দের সঙ্গে তিনি খাওয়ার গল্প করেন, যেন আল্লাহর ইবাদাতের পর এই পৃথিবীতে একটাই আনন্দের কাজ আছে; আর সেটা হলো খাওয়া। খাওয়া ছাড়াও যে গল্প করার অন্য বিষয় থাকতে পারে ভদ্রলোক বোধ হয় সেটা জানেন না।

তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে বলতে শুরু করলেন,

গরুর গোশততে খুব চর্বি হয়েছিল ভাই; গোশতের ভাঁজে ভাঁজে চর্বি।

তাই! ভালো তো।

চর্বিদার গোশত রান্না করা কিন্তু বেশ কঠিন কাজ। বাবুর্চিরা করে কি, যেহেতু চর্বি বেশি তেল দেয় কম। এটা কিন্তু ঠিক না। চর্বিদার গোশতে তেল লাগে বেশি।

জানতাম না তো।

অনেক ভালো ভালো বাবুর্চিই ব্যাপারটা জানে না ভাই। রান্না তো খুব সহজ ব্যাপার

না। আমি নিজে বাবুর্চির পাশে বসে রান্না দেখিয়ে দিয়েছি সেই দিন।

খুব ভালো করেছেন। আপনি যখন দেখিয়ে দিয়েছেন, তাহলে খেতেও ভালো হবার কথা। তো খেতে কেমন হয়েছিল?

আমি নিজের মুখে কী বলব—আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি, খেয়ে দেখবেন।

রেখে দিয়েছেন মানে? বৃহস্পতিবার ফিস্ট হয়েছে আজ হলো শনিবার।

দুই বেলা নিয়ম করে গরম করেছি। নিজের হাতেই করেছি। অন্যের কাছে এসব দিয়ে ভরসা পাওয়া যায় না। ঠিকমতো ঝাল দেবে না। গোশত টক হয়ে যাবে। বসুন, আমি নিয়ে আসছি।

জহুরুল সাহেব বেশ আনন্দচিত্তে গোশত আনতে গেলেন। আজ দিনটা মনে হয় আল্লাহর ইচ্ছায় ভালোই যাবে। সকালে ভরপেট খেয়ে নিলে, সারাদিন আর খাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। আজ সোমবার হলে রোজা রেখে দিতাম। তবে আল্লাহ যখন খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আজকে আর রোজা রাখব না।

ছোট ফুপার বাসা থেকে ভোরবেলা অভিকে নিয়ে বের হয়েছি ফজরের সময়। বাই তখনো ঘুমে। কাজের মেয়েটা জেগে ছিল। আমি হুজুর টাইপ বলে এই মেয়ে আমার সামনে পর্দা করে চলে। আমি বের হব দেখে মাথায় কাপড় টেনে এসে দরজা খুলে দিয়ে পর্দার আড়ালে গিয়ে সজোরে একটা সালাম দিলো। আমি বের হওয়ার সময় এই ধরনের সালাম সে দেয় না।

আমি সালামের উত্তর দিয়ে বললাম, ব্যাপার কী?

সে নিচু স্বরে বলল, খাস দিলে আফনে একটু দোয়া করবেন ভাইজান। আমার আদরের মাইয়াডা বহুত দিন হইছে নিখোঁজ।

বলো কী? ইন্না লিল্লাহ। কতদিন হয়েছে নিখোঁজ?

তা ধরেন গিয়া দুই বছর হইছে। এক বাড়িত কাম করত। এরা মাইর-ধইর করত। একদিন বাড়ি থাইক্যা পালাইয়া গেছে। আর কোনো খুঁইজ নাই।

আমার কেমন অবাক লাগছে। সমাজের সর্ব নিম্নস্তরে যাদের বাস তাদের আবেগ-টাবেগ বোধ হয় কম থাকে। দু-বছর ধরে মেয়ে নিখোঁজ, এই সংবাদ সে দিচ্ছে কত

সহজ গলায়। যেন তেমন কোনো ব্যাপার না।

নাম কী তোমার মেয়ের?

লুতফুন্নেসা। লুতফা বইলা ডাকি।

বয়স কত?

ছোট মাইয়া, সাত আট বচ্ছর বয়স। ভাইজান আফনে একটু আল্লাহর কাছে দুয়া করলে মাইয়াডারে ফেরত পামু আমার বিশ্বাস; মাইয়াডা ঢাহা শহরেই আছে।

জানো কীভাবে ঢাকা শহরে আছে?

আয়না পড়া দিয়া জানছি। আপনের ফুপা যেই পীরের মুরিদ তার এক খাদেম আয়না পড়া দিয়া পাইছে। এখন আপনে একটু দুয়া করলেই পাইয়া যামু।

তোমার মেয়ের জন্যে যার দোয়া সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে সেটা হলো তুমি আর তোমার স্বামীর। নামায পড়ো?

জি না ভাইজান; কাম-কাইজ কইরা নামাযের সময় থাকে না।

নামায পড়া শুরু করে দাও। এখন থেকেই নিয়ত করে ফেলো। সঠিকভাবে নিয়ত করবে। হাদিসে আসছে, ইন্নামাল আ'মা-লু বিন নিয়্যাহ। সকল কাজ নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। তাই আগে নিয়ত ঠিক করতে হবে।

নিয়ত কীভাবে করমু ভাইজান, নাওয়াইতুয়ান...?

নিয়ত করা মানে মুখে মুখে কোনো কিছু পড়া না। নিয়ত করার মানে হলো কোনো কাজ করার জন্যে মনস্থির করা এবং সংকল্পবদ্ধ হওয়া বুঝতে পারছ?

জি ভাইজান।

আল্লাহর রাস্তায় চলার সঠিক নিয়ত করে ফেলো। মেয়েকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে থাকো। আমি অবশ্যই আল্লাহর কাছে তোমার মেয়ের জন্যে দুয়া করব এবং তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। তবে আমি বা ওই আয়নাপড়া পীরসাব কিন্তু কিছুই করার ক্ষমতা রাখি না। সবকিছু কিন্তু আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে।

জি ভাইজান।

আয়না পড়া বা এই ধরনের তদবির নেয়া ইসলামে জায়েজ নেই। এরপর থেকে এই ধরনের কাজ আর কখনো করবা না, ঠিক আছে?

জি আচ্ছা ভাইজান।

সে আবার একটা লম্বা সালাম দিলো।

সকালের শুরুটা হলো সালামের মাধ্যমে। শুরু হিসেবে মন্দ না।

জহুরুল সাহেব তার সেই বিশেষ গরুর গোশতের বাটিটা নিয়ে এসেছেন। আনার সময় আবার ভালো করে গরম করে এনেছেন। গোশত বলে অবশ্য এই বাটিতে বর্তমানে কিছুই নেই। ঝালের চোটে সব গোশত গলে কালো রঙের ঘন স্যুপের মতো হয়ে গেছে। হালিমের মতো দেখাচ্ছে, ডিসেন্টের হালিম। যেই হালিমে গোশতের কোনো টুকরো থাকে না। গোশত থাকে হালিমের ডালের সাথে মেশানো। চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলা যায়। মতিঝিলের ডিসেন্টের এই হালিম আমার বেশ প্রিয়। শুধু রোজার সময় পাওয়া যায়। দামে বেশ চড়া তাই সব সময় খাওয়া হয় না। তবে ফিস্টের গলে যাওয়া গরুর গোশতের ক্ষেত্রে জহুরুল সাহেবের বিবেচনা আছে। তিনি সঙ্গে চায়ের একটা চামচ এনেছেন। আমি সেই চামচে তরল গরুর গোশত নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে এক চুমুক মুখে দিয়ে বললাম, আলহামদুলিল্লাহ অসাধারণ লাগছে। অ্যারাবিয়ান খাবসার কাছাকাছি।

জহুরুল সাহেবের চোখ চকচক করছে। তিনি উজ্জ্বল মুখ করে বললেন, বাসি হওয়ায় টেস্ট আরও খুলেছে তাই না ভাইজান? গোশতের কিন্তু এটাই একটা মজা, যত বাসি হয় তত বেশি মজা লাগে। টেস্ট খুলেছে না?

খুলেছে বললে কম বলা হবে, এক্কেবারে ডানা মেলে উড়াল দিয়েছে।

গরম গরম পরোটা দিয়ে খেলে আরও স্বাদ পেতেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি দৌড়ে গিয়ে দুটা পরোটা নিয়ে আসি। সাতটা বাজে, পিন্টুর হোটেলে পরোটা ভাজা শুরু করেছে।

পরোটা আনার কোনো দরকার নেই। আপনি আমার সামনে আরাম করে বসুন তো, বরং এক কাজ করুন—আরেকটা চামচ নিয়ে আসুন, দুজনে মিলে মজা করে খাই।

না না ভাই। তা কি করে হয়। এখানে তো অল্পই আছে।

নিয়ে আসুন তো চামচ। ভালো জিনিস একা খেতে আরাম হয় না।

এটা একটা সত্য কথা বলেছেন।

জহুরুল সাহেব চামচ আনতে গেলেন। ভদ্রলোকের জন্যে আমার মায়া লাগছে। গত দুমাস ধরে তার কোনো চাকরি নেই। ব্যাংকে ভালো চাকরি করতেন। ভালোই একটা পোস্টে ছিলেন। ইসলাম প্র্যাকটিস করা শুরু করার পর যখন শুনেছেন, ব্যাংকের চাকরির টাকা হালাল হবে না—যেহেতু এটা সুদভিত্তিক লেনদেন—তখন এক ধাক্কায় চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। এই বয়সে একজন মানুষের চাকরি চলে গেলে আবার চাকরি জোগাড় করা কঠিন। ভদ্রলোক কিছু জোগাড় করতে পারছেন না। মেসের ভাড়া তিন মাস বাকি পড়েছে। যতদূর জানি মেসের খাওয়াও তার বন্ধ। ফিস্টে তার নাম থাকার কথা না। বাজার-টাজার করে দিয়েছেন, রান্নার সময় কাছে থেকেছেন, এই বিশেষ কারণে হয়তো তার খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

জহুরুল সাহেব চামচ নিয়ে এসেছেন। এখন তিনি আমার সামনে বসে আরাম করে খাচ্ছেন। তাকে দেখে এই মুহূর্তে মনে করার কোনো কারণ নেই যে, পৃথিবীতে নানান ধরনের দুঃখ-কষ্ট আছে। যুদ্ধ চলছে আফগানে, ইরাকে। ফিলিস্তিনে অকারণে নিরীহ মুসলিমদের হত্যা করা হচ্ছে। সিরিয়াতে ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপর বিমান থেকে বম্বিং করে নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। তার নিজের সমস্যাও নিশ্চয়ই অনেক। দুমাস বাড়িতে মানি অর্ডার যায়নি। বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় আছে। ভদ্রলোক নির্বিকার।

আব্দুল্লাহ ভাই।

জি।

হাড়গুলো দেখেছেন। কুড়কুড়া হাড়।

হুম।

দারুণ স্বাদ না! এই হাড়গুলো চুষে চুষে খেতে হয়। আরাম করে একটা হাড় মুখে দিয়ে চুষে চুষে খান, মজা পাবেন।

আমি একটা হাড় মুখে দিয়ে চুষতে লাগলাম।

তিনিও একটা মুখে নিলেন। চুকচুক শব্দ করে হাড় চুষতে লাগলেন। তিনি কুড়কুড়া হাড় কামড় দিয়ে ভাঙছেন। কুড়মুড় শব্দ হচ্ছে, আনন্দে তার চোখ প্রায় বন্ধ।

জহুরুল সাহেব।

জি।

চাকরি-বাকরির কোনো ব্যবস্থা কি হয়েছে?

এখনো হয়নি, তবে হবে ইনশা-আল্লাহ। আমার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে, এদের বলেছি; এরা আশা দিয়েছে।

শুধু মানুষের দেয়া আশার ওপর ভরসা করাটা কি ঠিক হচ্ছে।

আমার খুব ক্লোজ একজনকে বলেছি। বড় গার্মেন্টসের মালিক। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি। এখন তার রমরমা ব্যবসা। গাড়ি-টাড়ি কিনে হুলুস্থুল। বাড়িও করেছে গুলশানে। পূর্বাচলে বিশাল কমার্শিয়াল প্লট কিনে ফেলে রেখেছে।

তিনিও কি চাকরির আশা দিয়েছেন?

পরে যোগাযোগ করতে বলেছে। সেদিনই সে চায়না যাচ্ছিল। দারুণ ব্যস্ত। কথা বলার সময় পায় না। এরই মধ্যে সে পেস্ট্রি-কোক খাইয়েছে। কিংস-এর পেস্ট্রি, স্বাদই অন্যরকম। মাখনের মতো মোলায়েম, মুখের মধ্যে গলে যায়, চাবাতে হয় না।

আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু?

বললাম না, স্কুলজীবনের বন্ধু। নাম হলো গিয়ে ইয়াকুব। স্কুলে সবাই ডাকত 'বেকুব' বলে।

আসলেই কি বেকুব?

তখন তো বেকুবের মতোই ছিল। তবে স্কুলজীবনের স্বভাব-চরিত্র দেখে কিছুই বোঝা যায় না ভাই। আমাদের ফার্স্ট বয় ছিল আব্দুর রাহমান। সে কী মারাত্মক ছাত্র! অঙ্কে কোনো দিন এক শর নিচে পায় নাই। প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় একটা উপপাদ্য ভুল করেছে। সেইটার নম্বর কাটা গেছে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। সেই আব্দুর রাহমানের সঙ্গে একুশ বছর পর দেখা। গাল-টাল ভেঙে, চুল পেকে কী

অবস্থা! ভারি মোটা চশমা পরেছে। দেখলাম চশমার একটা ডান্ডা আবার ভাঙা। সুতা দিয়ে কানের সাথে বেঁধে রেখেছে। দেখে ভীষণ খারাপ লাগল।

অঙ্কে এক শ পাওয়া ছেলের এ কী অবস্থা, মন তো আসলেই একটু খারাপ হবারই কথা। অঙ্কে অবশ্য টেনেটুনে পাশ করলে কানে সুতা বেঁধে চশমা পরতে হতো না।

একদম ঠিক বলেছেন। একুশ বছর পর দেখা। কোথায় কুশল জিজ্ঞেস করবে, ছেলে-মেয়ে কত বড় এসব জিজ্ঞেস করবে—তা না, ফট করে এক শ টাকা ধার চাইলো।

তাই।

জি।

আপনি কি করলেন? ধার দিয়ে দিলেন?

কুড়ি টাকা পকেটে ছিল, তা-ই দিয়ে দিলাম। খুশি হয়ে নিয়েছে।

হুম। মেসের ঠিকানা আবার তাকে দিয়ে দেননি তো? মেসের ঠিকানা দিয়ে থাকলে মহাবিপদে পড়বেন। দুদিন পর পর টাকার জন্যে এসে বসে থাকবে। আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলবে।

জহুরুল সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, একদম শৈশবের বন্ধু। স্কুলজীবন একসাথে কাটিয়েছি, তার দুরবস্থা দেখে মনটা এত খারাপ হয়েছে যে, আমার নিজের চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। চিন্তা করেন সুতা দিয়ে কানের সাথে চশমা বাঁধা...

জহুরুল সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার নিজের ভবিষ্যতের চেয়ে বন্ধুর ভবিষ্যতের চিন্তায় তাকে বেশি কাতর বলে মনে হলো।

আব্দুল্লাহ ভাই।

বলুন ভাই।

ভালো একটা নাস্তা হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ... নাকি বলেন?

হ্যাঁ তা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি যে কষ্ট করে আমার অংশটা জমা করে রেখেছেন তার জন্যে শুকরান। জাযাকাল্লাহু খাইরান।

ওয়া ইয়্যাকা ভাই। তবে এটা কিন্তু ধন্যবাদের কোনো বিষয়ই না। এতদিন পর ফিস্ট হচ্ছে, আর আপনার মতো একজন মানুষ বাদ পরবে, এটা হতে পারে না। আর তা ছাড়া আপনি যেদিন মেসে খান না, সেদিনের আপনার খাবারটা আমি খেয়ে ফেলি।

ভালো করেন। ভেরি গুড। অবশ্যই খেয়ে ফেলবেন। দেশে টাকা পাঠিয়েছেন এ মাসে?

গত মাসে পাঠিয়েছি। এই মাস বাদ পড়ে গেল। তবে সমস্যা হবে না, আল্লাহ চালিয়ে নেবেন। আর আমার স্ত্রী খুবই বুদ্ধিমতী, আলহামদুলিল্লাহ। মহিলা আল্লাহর ইচ্ছায় একভাবে না-একভাবে চালিয়ে নেবে।

আপনি যে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন সেই খবর কি স্ত্রীকে জানিয়েছেন?

জি না, আপনার ভাবি মনটা খারাপ করবে। কী দরকার। রিজিক যদি কপালে থাকে তাহলে চাকরি তো পাচ্ছিই ইনশা-আল্লাহ। মাঝখানে কিছুদিনের জন্যে পরিবারকে শুধু শুধু টেনশনে ফেলে লাভ কী? আজই ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা করব। চা খাবেন আব্দুল্লাহ ভাই?

জি না। দরজা-টরজা বন্ধ করে যোহর পর্যন্ত ঘুম দেবো। আমার স্বভাব হয়ে গেছে বাদুড়ের মতো। দিনে ঘুমাই, রাতে জেগে থাকি।

কাজটা ঠিক হচ্ছে না ভাই সাহেব। আল্লাহ বলেছেন, রাত ঘুমের জন্যে। শরীরের দিকেও তো লক্ষ রাখতে হবে। শরীর নষ্ট হলে, মন নষ্ট হয়। আমার শরীর ঠিক আছে বলেই তো এত বিপদ-আপদে মনটাও ঠিক আছে। শরীরটা ঠিক রাখবেন।

আমার আবার উল্টো। মনটা ঠিক রাখি। যাতে শরীরটা ঠিক থাকে।

জহুরুল সাহেব বাটি এবং চামচ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, ছোট্ট একটা অনুরোধ করতে চাই আব্দুল্লাহ ভাই। আমার জন্যে কি ছোট্ট একটা কাজ করে দেবেন?

বলুন ভাই। সামর্থ্যের মধ্যে হলে অবশ্যই করে দেবো ইনশা-আল্লাহ।

আপনার সামর্থ্যের মধ্যেই।

আচ্ছা বলুন কী ব্যাপার।

মেসের ম্যানেজার আমাকে বলেছে সোমবারের মধ্যে মেস ছেড়ে দিতে। আজেবাজে অনেক কথা শুনিয়েছে, গালিগালাজ করেছে। আপনি যদি একটু বলে দেন ! তাহলে খুব উপকার হয় ভাই। ম্যানেজার আবার আপনাকে ভীষণ মানে।

আমি এখনই বলে দিচ্ছি।

তাকে বললাম যে চাকরি হয়ে যাচ্ছে। আমার বন্ধু গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে বলেছি। বিশাল বড় গার্মেন্টসের মালিক। চাকরি তার কাছে কিছুই না। সে এক নিশ্বাসে দশজন লোককে চাকরি দিতে পারবে। ম্যানেজার আমার কথা বিশ্বাস করে না। আপনি বললে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে।

আমাদের মেসের ম্যানেজারের নাম নবাব জমির আলী। নামে নবাব হলেও নামের সঙ্গে তার চেহারার কোনো সংগতি নেই। ভীষণ রোগা এবং বেটে একজন মানুষ। সাধারণত লম্বা মানুষদের কুঁজো হয়ে হাঁটতে দেখা যায়। বেটেরা সচরাচর কুঁজো হয় না। কিন্তু আমাদের ম্যানেজার সাহেবের কথা ভিন্ন। তিনি বেটে এবং একই সাথে তিনি খানিকটা কুঁজো। ব্যক্তিবিশেষের সামনে আবার তার এই কুঁজোভাব প্রবল হয়। আমি সেই ব্যক্তিবিশেষের একজন। আমাকে দেখলে তিনি দেড় ইঞ্চি বেশি কুঁজো হয়ে যান। ইদানীং লক্ষ করেছি, তিনি কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে ভয় পান অথবা বলা যায় সম্মান করেন। যখন ইসলাম বুঝতাম না তখন এই লোক আমার সাথে কথা বলত হেঁয়ালি করে। আমার জন্যে সামান্যতম সম্মানবোধ আমি তার কাছে দেখিনি। কিন্তু যখন থেকে নামায শুরু করেছি, গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবির বদলে খয়েরি জোব্বা গায়ে দিচ্ছি, তখন থেকেই তার ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন। কী জানি, আবার পীর-টির ভাবা শুরু করল কি না?

নবাব জমির আলী তার চেয়ারটাতে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। আয়েশ করে কাপ থেকে পিরিচে চা ঢালছে। এবং আরাম করে পিরিচে করে চা খাচ্ছে। ওই লোককে আমি কখনো চায়ের কাপে চা খেতে দেখিনি। আমি কাছে এসে হাসিমুখে বললাম, আসসালামু আলাইকুম, নবাব সাহেবের খবর কী?

ভদ্রলোক যেভাবে চমকে গেল তাতে মনে হলো, সাত রিখ্টার স্কেলের একটা ছোট্ট ভূমিকম্প হয়ে গেছে। পিরিচের সব চা তার জামায় পড়ে গেল।

আমি বললাম, কী হলো? করছেন কী আপনি?

তিনি বিব্রত অবস্থায় মুখে হাসির রেখা টেনে জবাব দিলেন,

চা খাচ্ছি স্যার।

খুব ভালো। বেশি বেশি করে চা খান। কোন একজন রিসার্চ করে নাকি নতুন বের করেছে—দৈনিক যে সাত কাপ চা খায় তার হার্টের আর্টারি কখনো ব্লক হয় না। হার্ট ভালো থাকে।

মেনি মেনি থ্যাংকস স্যার। সো কাইন্ড অফ ইউ।

যেভাবে তিনি সো কাইন্ড অফ ইউ বললেন তাতে ধারণা হতে পারে হার্টের আর্টারি-সংক্রান্ত রিসার্চটা আমার নিজের হাতে করা। আমি অবসর সময়ে মেসের ঘরের দরজা বন্ধ করে হার্ট আর চা নিয়ে এই গবেষণা করেছি। বিষয়টা আসলে এমন নয়।

আমি তাকে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম,

জহুরুল সাহেবকে নাকি মেস ছেড়ে যেতে ফাইনাল নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন? কথা কি সত্যি?

জি। তিন মাসের রেন্ট বাকি। আর নানান যন্ত্রণা করে। মেসের অন্যান্যরাও তার ওপর বিরক্ত। সবাই কমপ্লেইন করে। দারুণ যন্ত্রনা করছে সে?

কী যন্ত্রণা করেছে?

রান্নার সময় বাবুর্চির পাশে বসে থাকে। ১০০ টাকা করে চাঁদা, একটা পয়সা দেয় নাই; অথচ ফিস্ট খেয়ে বসে আছে।

চাঁদা না দিলেও খাটাখাটনি তো করেছে। গরুর গোশত কিনে এনেছে। গরুর গোশত যে কেউ কিনতে পারে না। খুবই জটিল ব্যাপার। গরু ভেবে কিনে এনে রান্নার পর প্রকাশ পায় মহিষ। রবি ঠাকুরের মহেশ না। অরিজিনাল মহিষ।

নবাব জমির আলী তাকাচ্ছেন। আমার কথাবার্তার ধরন বুঝতে পারছেন না। কী বলবেন তাও গুছিয়ে উঠতে পারছেন না।

ম্যানেজার সাহেব।

জি স্যার।

জহুরুল সাহেবকে আর কিছু বলবেন না।

তিন মাসের রেন্ট বাকি পড়ে গেছে। অন্য পার্টিকে কথা দিয়ে ফেলেছি। মানুষের কথার একটা দাম আছে। ঠিক না স্যার?

ঠিক তো বটেই। কথা দেয়ার ব্যাপারে আমাদের মুসলিমদের তো এক্সট্রা সচেতন থাকতে হয়। মুনাফিকরা কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ করে; মুমিনরা নয়।

জি স্যার।

শুনুন তারপরও একটা ব্যবস্থা করুন। আশা করছি একমাসের মধ্যে সব পেমেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

কীভাবে হবে? শুনেছি উনি ব্যাংকের ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যাংক থেকে যে টাকা তার পাওনা ছিল তাও নাকি তিনি নেবেন না। সুদি ব্যাংকের কাছ থেকে নাকি আর কোনো টাকা-পয়সাই নেবেন না? কী নাকি গন্ডগোলও করে এসেছেন?

গন্ডগোল তো থাকবেই। পৃথিবীতে বাস করবেন আর গন্ডগোলে পড়বেন না, তা তো হয় না। এই গন্ডগোল নিয়েই বাস করতে হবে। উপায় কী? মনে থাকবে তো কী বললাম?

জি স্যার।

আমি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। ম্যানেজার নবাব অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জি স্যার বলেছে বলেই ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। ইসলামের ওপর না থাকা মানুষের বিনয়ের বাড়াবাড়িটাই সন্দেহজনক। আমার নিজের ধারণা মিথ্যা বলার সময় বিনয় ব্যাপারটা ব্যবহার না করতে পারলে মিথ্যা ধরে ফেলা সহজ হতো। বিনয়ের কারণে সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করা সমস্যা হয়। মিথ্যার সঙ্গে বিনয় মিশিয়ে দিলে সেই মিথ্যা ধরা কঠিন হয়ে যায়।

টানা একটা ঘুম দিলাম যোহর পর্যন্ত। এই সময় মেসটা প্রায় ফাঁকাই থাকে। বেশির ভাগই চাকরি-বাকরি করে, তাই অফিসে থাকে। বাকিরা বাইরে খেতে বের হয়ে যায়। মেসে শুধু এক বেলা খাবার ব্যবস্থা—রাতে। এক কাপ চা খেতে হলেও রাস্তা পার হয়ে স্টলে যেতে হবে। ইদানীং আমাদের এলাকা নতুন এক চা-ওয়ালাদের আবির্ভাব

হয়েছে। এরা বিশাল ফ্লাস্কে করে চা এবং কফি ফেরি করে বেড়ায়। চা এবং কফির দাম এদের ফিক্সড। চা পাঁচ টাকা, কফি দশ টাকা। স্বাদে কোনোভাবেই নামিদামি রেস্তোরাঁর থেকে এরা কম না। তবে চিনি বা দুধের দাম বাড়লে এদের চা বা কফির দাম বাড়ে না; বরং কাপের সাইজ ছোট হয়। আমাদের এখানে যে ছেলেটা চা-কফি বিক্রি করে তার নাম রাজু। দেখতে রাজপুত্রের মতো, আসলে ভিখিরিপুত্র।

বারান্দায় এসে রাজুকে খুঁজলাম। ভরদুপুর বলে রাজু এখনো আসেনি, তবে অপরিচিত এক লোক এসেছেন। বারান্দায় রাখা টুলটাতে শুকনো মুখে বসে আছেন। ভদ্রলোককে আগে কখনো না দেখলেও তাকে দেখামাত্র চিনলাম, কারণ তার চশমার একটা ডাঁট ভাঙা, সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। ভদ্রলোকের ভ্রু কুঁচকে আছে। তিনি বেশ সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমায় দেখছেন। আমি হাসিমুখে সালাম দিয়ে বললাম, কি ভাই ভালো আছেন?

তিনি হকচকিয়ে গেলেন, উঠে দাঁড়িয়ে, হাত দিয়ে স্যালুটের ভঙ্গি করলেন।

জহুরুল সাহেবের কাছে এসেছেন তাই তো?

জি স্যার।

কি জন্যে এসেছেন তার কাছে? টাকা ধার চাইতে?

হঠাৎ এমন একটা কথায় ভদ্রলোক খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। চট করে কিছু বলতে পারছেন না। তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। আবার কিছু একটা বলতে খুব চেষ্টা করছেন।

আমি বললাম, জহুরুল সাহেব আমাকে আপনার কথা বলেছেন। তিনি আপনার খুবই প্রশংসা করেছেন। প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় একটা উপপাদ্য নাকি ভুল হয়েছিল আপনার। তাড়াহুড়ো করেছিলেন নিশ্চয়ই। যারা খুব ভালো পারে তাদের অনেক সময় ওভার কনফিডেন্সে সমস্যা হয়। যাই হোক কেমন আছেন বলুন।

জি স্যার ভালো। জহুরুল কখন আসবে?

তা তো ভাই বলতে পারব না।

এখানে থাকেন না?

এখানেই থাকে, তবে আর কতদিন থাকতে পারবেন সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

মানে?

মানে ওনার অবস্থা আপনার থেকেও খারাপরে ভাই। আপনি তো ফার্স্ট বয় হয়ে হাত পেতে দিন যাপন করে যাচ্ছেন; অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু জহুরুল সাহেব তো সেটাও করতে পারছে না। আচ্ছা আপনার নামটা যেন কী?

আব্দুর রাহমান।

শুনুন আব্দুর রাহমান সাহেব। শুধু শুধু ওনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করে কোনো লাভ হবে না। এখানে ওনার খোঁজে আসাও অর্থহীন। বাড়ি চলে যান।

চলে যাব?

যাবেন তো অবশ্যই। তবে যাবার আগে আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারি। শুধু চা। খাবেন?

আব্দুর রাহমান হ্যাঁ না কিছুই বলল না।

আমি বললাম,

তার আগে চলেন যোহরের নামাযটা আদায় করে নিই। সোয়া একটায় জামাত। সব মাসজিদে এখন দেড়টায় নামায শুরু হয়, কিন্তু আমাদের এই মাসজিদে সব সময় সোয়া একটায় যোহরের নামায হয়। হোক সেটা শীতকাল কিংবা গরমকাল।

ডাঁটভাঙা সুতো প্যাঁচানো চশমার ভেতর দিয়ে যেই চোখ দেখা যাচ্ছে তাতে বিষণ্ণতা সুস্পষ্ট। তার মুখও বলে দিচ্ছে সে পুরোপুরি আশাহত।

আমি ভদ্রলোককে মাসজিদে নিয়ে গেলাম। সময় নিয়ে যোহরের নামায আদায় করলাম। তারপর চা খাওয়ালাম, সিঙ্গারা খাওয়ালাম। এখানেই শেষ করলাম না, রাস্তার পাশে পরিচিত এক চশমার দোকানে নিয়ে গিয়ে চশমার ডাঁট লাগিয়ে দিলাম। আমার সর্বমোট ৫০ টাকা খরচ হলো।

ভদ্রলোক বললেন, ভাই সাহেব আপনাকে একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন। আপন ভেবে বলছি।

বলুন কিছু মনে করব না।

কথাটা বলতে খুবই লজ্জা পাচ্ছি। আপনি অতি মহৎপ্রাণ এক ব্যক্তি। আপনাকে বিব্রত করতেও লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে...।

লজ্জায় মাথা কাটা গেলে বলা লাগবে না। বাদ দেন।

না মানে ইয়ে...।

আচ্ছা বলুন। মাথা কাটা যাওয়ার কিছু নেই।

নিদারুণ এক সংকটে পড়েছি ভাই সাহেব। আত্মহত্যা ছাড়া এখন আর কোনোই পথ দেখছি না।

কি সমস্যা? একমাত্র ছেলে অসুস্থ? টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না?

ধরেছেন ঠিকই। তবে ছেলে না; মেয়ে। আমার কনিষ্ঠা কন্যা। সকাল থেকে হাঁপানির মতো হচ্ছে। ডাক্তার ইনজেকশনের কথা বলল।

ইনজেকশনের দাম কত?

শ খানেক টাকা হলে হয়। ইনজেকশন, সেই সঙ্গে কী ট্যাবলেট যেন দিয়েছে। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, আমাদের যে অবস্থা এতে চিকিৎসা করার টাকা কোথায় পাব? তুমি বরং এক কাজ করো, মেয়েটাকে গলা টিপে মেরে ফেলো।

উনি গলা টিপে মারতে রাজি হচ্ছেন না?

আব্দুর রাহমান আমার এই কথায় অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আমি বললাম, এসব কঠিন কাজ স্ত্রীলোক দিয়ে হবে না। গলাটিপে হত্যা স্ত্রীলোকের কাজ না। এসব হলো পুরুষের কাজ। গলা টিপে মারতে হলে আপনাকেই মারতে হবে।

ভাই সাহেব ঠাট্টা করছেন?

হ্যাঁ ঠাট্টা করছি। তবে মৃত্যু কোনো ঠাট্টা-তামাশার বিষয় না।

ভাই, টাকাটা পেলে খুব উপকার হতো।

হু। স্কুলজীবনে আপনি অঙ্কে খুব ভালো ছিলেন তাই না? কেমন ভালো ছিলেন

প্রমাণ দিন দেখি। সহজ একটা অঙ্কের খেলা খেলব। একটা প্রশ্ন করব কারেক্ট উত্তর দেবেন। এক শ টাকা নিয়ে চলে যাবেন।

আব্দুর রাহমান ক্ষীণ স্বরে বলল, কী অঙ্ক?

একটা বাড়িতে চারটা টিউবলাইট জ্বলছিল। গভীর রাতে কথা নেই, বার্তা নেই, শুরু হলো ভয়াবহ ঝড়। হঠাৎ করে একটা টিউবলাইট গেল নিভে। এখন আপনি বলুন তো ওই বাড়িতে টিউবলাইট আছে কয়টা?

তিনটা!

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, হয়নি। একটা টিউবলাইট নিভে গেছে ঠিকই। টিউবলাইটের সংখ্যা তো কমেনি। টিউবলাইট চারটাই আছে। আপনি তো ভাই আগের সেই অঙ্কে এক্সপার্ট হওয়ার কৃতিত্বটা ধরে রাখতে পারেননি। টাকাটা দিতে পারলাম না। কিছু মনে করবেন না।

আব্দুর রাহমান দাঁড়িয়ে আছে, আমি হাঁটা শুরু করেছি। আব্দুর রাহমান মেয়ের অসুস্থতা নিয়ে মিথ্যা গল্প বলছেন। খারাপ লাগছে। কারণ, আমি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি। হাত পেতে জীবনযাপনের মজা পেয়ে গেলে এই সমস্যা; এরা আর কাজ করতে পারে না। সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক এক উসিলায় হাত পাতে।

এখন মেসে ফিরে যাব। দুপুরে না খাওয়াতে খিদেয় নাড়িভুঁড়ি পাক দিচ্ছে। সামনের হোটেলটায় খেয়ে নেয়া যায়। গরম ডিমভাজা দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে। ডিম ভাজার সময় কাঁচামরিচ কুচি কুচি করে ডিমের ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে করে ডিম মুখে নিলেই মাঝে মাঝে কাঁচামরিচে কামড় পরে। দারুণ এক স্বাদ। আগুন-গরম ভাত কাঁচামরিচের ডিমভাজা দিয়ে খেতে অতি উপাদেয়। তবে খেতে হয় চুলো থেকে ভাত নামানোর সঙ্গে সঙ্গে। দেরি করা যায় না।

তাহাজ্জুতের নামায ঘরে পড়া ভালো। কিন্তু আমার ঘরে নামায পড়ার সেই রকম জায়গা নেই। তাই রাতে মাসজিদের বারান্দাতেই নামায আদায় করতে হয়। ইদানীং প্রায় সব মাসজিদ তালাবদ্ধ থাকে। পরিচিত ছাড়া মাসজিদে থাকা এখন একরকম অসম্ভব হয়ে গেছে, তবে কিছু মাসজিদের বারান্দা আছে। যেসব মাসজিদের বারান্দা খোলা থাকে সেসব বারান্দায় নামায আদায় করা যায়। মাসজিদের খাদেম সাহেব জেগে থাকলে আড়চোখে তাকায়। কিন্তু কিছু বলেন না। আসলে নামাযে বাধা দেয়ার

সাহস হয় না কারও। আমি ঘর থেকে বেরুলাম রাত বারোটায়। দরজা তালাবদ্ধ করে বেরুচ্ছি, দেখি জহুরুল সাহেব। কলঘর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরছেন। মুখ ভেজা, কাঁধে গামছা। রাত বারোটায় আমার মন-টন খুব ভালো থাকে। নিজের রবের সামনে দাঁড়াতে যাব—মন তো ভালো থাকবেই। কাজেই আমি উল্লাসের সঙ্গেই বললাম, কী খবর জহুরুল সাহেব।

তিনি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন।

আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন?

তিনি আবারও হাসলেন। আমি বললাম, ইয়াকুব সাহেবের ওখানে গিয়েছিলেন আজকে?

জি ভাই গিয়েছিলাম।

দেখা হয়নি তার সাথে?

দেখা হয়েছে। তবে ইয়াকুব অতিরিক্ত ব্যস্ত।

কথা হয়নি নাকি?

হয়েছে ভাই। কথা হয়েছে। চাকরির ব্যাপারটা বললাম।

আগেও তো বলেছিলেন। তাই না? আবার কেন বলতে হলো?

দারুণ ব্যস্ত মানুষ ভাই। ভুলে গিয়েছে। নানান কাজকর্ম নিয়ে থাকে তো। আজকে তার আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটল। তার মনটা ছিল খারাপ।

কী দুর্ঘটনা?

চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে নতুন গাড়ি কিনেছে। সেই গাড়ির জন্যে নতুন ড্রাইভার রেখেছে। নতুন ড্রাইভার প্রথম দিন গাড়ি নিয়ে বের হয়েই গাড়ির হেডলাইট ভেঙে ফেলেছে। ওই নিয়ে নানান হইচই, ধমকাধমকি চলছে; তার মধ্যে আমি গিয়ে পড়লাম।

আপনিও ধমক খেলেন ইয়াকুব সাহেবের কাছে?

জি না, আমি ধমক খাব কেন? সে তো আমার একদম ছেলেবেলার বন্ধু। শৈশবে একসাথে পুকুরে কত ঝাঁপিয়েছি। ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড। তবে গাড়ির হেডলাইট ভাঙার কারণে ইয়াকুবের মন খারাপ দেখে আমার মনটাও খারাপ হলো। এর মধ্যে চাকরির কথাটা তুলে ভুল করেছি।

ইয়াকুব সাহেব কি রেগে গেছেন?

ঠিক তা না। বলল যে, বায়োডাটা তার সেক্রেটারির কাছে দিয়ে যেতে। পাসপোর্ট সাইজের দুটি ছবির সাথে বায়োডাটা দিতে বলল, সে দেখবে।

সে আসলেই দেখবে বলেছে?

দেখবে তো বটেই। স্কুলজীবনের বন্ধু, ফেলবে কী করে? এই বায়োডাটা নিয়েই পুরো দিনটা ছোটাছুটি করতে হয়েছে আজকে। একদিনের মধ্যেই ছবি তুললাম। বায়োডাটা টাইপ করলাম। তারপর ঠিক পাঁচটার সময় গিয়ে একেবারে ইয়াকুবের হাতেই ধরিয়ে দিয়েছি।

ইয়াকুব সাহেব আপনার উৎসাহ আর কর্মতৎপরতা দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশি হলেন।

জহুরুল সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, কি? তিনি খুশি হননি?

জি না। একটু মনে হয় বেজার হয়েছে। তার বেজার হবার অবশ্য যুক্তিসংগত কারণ আছে, সে আমাকে বায়োডাটাটি সেক্রেটারির হাতে দিতে বলেছিল, আমি তা না করে তার হাতেই দিলাম—এতেই সে বিরক্ত হয়েছে। তার বিরক্ত হওয়াটা আসলে ঠিকই আছে। এত বড় একটা অর্গানাইজেশন চালায়। তার তো একটা নিয়মনীতি আছে। কথা নাই বার্তা নাই, হুট করে হাতে কাগজ ধরিয়ে দিলেই হবে না। ভুলটা আমারই।

জহুরুল সাহেব, ইয়াকুব সাহেবের ভাবসাব দেখে কি বোঝেন? ইয়াকুব আলী আপনাকে চাকরি দেবেন?

সবই আল্লাহর ইচ্ছা ভাই। কিন্তু যেহেতু সে আমার ছোটবেলার বন্ধু, সে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারেই না। আমার সামনেই সেক্রেটারিকে ডেকে বায়োডাটা তার হাতে তুলে দিয়েছে। তারপর বলেছে ওপরে 'আর্জেন্ট' লিখে ফাইলে রাখতে।

কবে নাগাদ চাকরি হবে বলে মনে করছেন? কোনো নির্দিষ্ট তারিখ কি আপনার বন্ধু বলেছেন?

আল্লাহ চাহে তো খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ। ইয়াকুব আমাকে এক সপ্তাহ পরে খোঁজ নিতে বলেছে। আগামী শনিবারের মধ্যে ইনশা-আল্লাহ হয়ে যাবে। স্বপ্নেও তা-ই দেখলাম।

এই দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আবার স্বপ্ন দেখার সময় কখন পেলেন? এর মধ্যে স্বপ্নও দেখে ফেলেছেন?

জি। ছোটাছুটি করে কাগজপত্র জোগাড় করে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, একটু রেস্ট নিই।

ইয়াকুবের পিএ বলল, বসুন। আপনাকে চা দিতে বলি, চা খান। চা খাওয়ার জন্যে বসেছি। বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে গেল। তখনই স্বপ্নটা দেখেছি। দেখলাম কী—কে যেন এসেছে। তার হাতে বিরাট এক মৃগেল মাছ। এইমাত্র ধরা হয়েছে। ছটফট করছে। লোকটা বলল, নিজের পুকুরের মাছ। আপনার জন্যে আনলাম। নিয়ে যান। মাছ স্বপ্নে দেখা খুবই ভালো। আব্দুল্লাহ ভাই?

হুম।

ভাই আমার কথা তো বললাম। এখন আপনার কথা বলুন। আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

হাঁটতে যাচ্ছি, আর সৃষ্টিকর্তার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি; তাঁর সাথে বাতচিতও করব।

কী বলেন এসব। আজব তো! রাতদুপুরে হাঁটবেন আবার সৃষ্টিকর্তার সাথে কথাও বলবেন? বুঝলাম না ভাই।

চলুন আজ আমার সঙ্গে—বুঝে যাবেন।

যেতে বলছেন? রাত জাগার তো অভ্যেস নেই। অনিয়ম হয়ে যাবে।

এক রাতে একটু অনিয়ম করলে কিছু হবে না।

খুবই টায়ার্ড লাগছে আব্দুল্লাহ ভাই। ভাবছি ঘুমোব।

ঘুম তো আপনার আসবে না। খিদে পেটে শুয়ে ছটফট করবেন। এর চেয়ে চলুন কোথাও নিয়ে গিয়ে আপনাকে খাইয়ে আনি। মনে হচ্ছে সারাদিন কিছুই মুখে দেননি।

সারাদিন খাইনি কথা ঠিক। কিন্তু আব্দুল্লাহ ভাই আপনি কী করে বুঝলেন?

বোঝা যায়। মানুষের সব খবর তার চোখে লেখা থাকে। ইচ্ছে করলেই সেই লেখা পড়া যায়।

আপনি চোখের লেখা পড়তে পারেন ভাই?

মাঝে মাঝে পারি। সব সময় পারি না। আপনি যে সারাদিন খাননি এটা আপনার চোখে এখন পড়তে পারছি। চলুন গল্প করতে করতে যাই।

গল্প করতে তো আমি পারি না। আর তা ছাড়া বলার মতো কোনো গল্পও আমার নেই আব্দুল্লাহ ভাই।

আছে। বলার মতো গল্প আছে। মানুষের জীবনের সব গল্পই বলার মতো। আপনার বিয়ের গল্প শুনব আজকে।

রাস্তায় নেমেই জহুরুল সাহেব বিস্মিত স্বরে বললেন, হাঁটতে তো ভালোই লাগছে মা শা আল্লাহ। রাস্তাগুলোও কেমন অন্যরকম, অন্যরকম লাগছে। আশ্চর্য তো। সৃষ্টিকর্তার সামনে দাঁড়ানো, তাঁর সাথে বাতচিতের ব্যাপারটাও মনে হয় আরও ইন্টারেস্টিং হবে আব্দুল্লাহ ভাই? ব্যাপারটা কী?

আমি ব্যাপার ব্যাখ্যা করলাম না। রাতের বেলায় যেমন রাস্তার চরিত্র বদলায়, মানুষের মনও বদলায়। এর ব্যাখ্যা একেকজন একেকভাবে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধিতে বাঁধ দিয়ে দেয়ার কী দরকার। যার যার উপলব্ধি থাক না তার তার মতো।

জহুরুল সাহেব বললেন, হাঁটতে হাঁটতে আমরা কোথায় যাব?

আমি বললাম, কোনো এক মাসজিদের বারান্দায় ইনশা-আল্লাহ। কিন্তু কোন মাসজিদ সেটা বলতে পারছি না। আচ্ছা বলুন, কীভাবে আপনাদের বিয়ে হলো।

রাজশাহী বেড়াতে গিয়েছিলাম। খালার শ্বশুর বাড়িতে। ওদের একান্নবর্তী পরিবার। পুরো বাড়িতে সারাদিন লোকজন গিজগিজ করছে। ওই বাড়ির সব থেকে বড় সমস্যা হলো খাওয়া-দাওয়া। কে কখন খায় কোনো ঠিক নেই। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে

কারও প্রতি কোনো যত্ন নেই। খেলে খাও, না খেলে খেয়ো না। ওই রকম ভাব। মাঝে মাঝে এমন বিশৃঙ্খলা হয় যে কী বলব। ধরেন, ভালো একটা পদ হয়তো রান্না হচ্ছে, এদিকে ওই রান্না শেষ হবার আগেই হয়তো দেখা গেল বাড়ির বেশির ভাগ মানুষই খেয়ে উঠে গেছে। কেউ জানেই না যে, মূল পদ এখনো চুলোয়। এখনো সেটার রান্না শেষ হয়নি।

জহুরুল সাহেব তার বিয়ের গল্পের জায়গায় খাওয়ার গল্প ফেঁদে বসেছেন। মোটাসোটা মানুষের এই এক দুর্বলতা। সব গল্প কোনো না-কোনোভাবে খাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তার এই খাওয়া-দাওয়ার ভেতর থেকে বিয়ের গল্প হয়তো শুরু হবে—তবে সেটা কখন হবে, বলা মুশকিল। ভদ্রলোকের সম্ভবত খিদেও পেয়েছে। খিদের সময় মানুষের শুধু খাবারের কথাই মনে পড়ে। তাকে খাওয়ানোর কী ব্যবস্থা করা যায় বুঝতে পারছি না। আজকেও পকেটবিহীন জোব্বা পড়ে বের হয়েছি। এই জোব্বা মনে হয় আর ব্যবহার করা যাবে না। জহুরুল সাহেব গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন। সেদিন কী হয়েছে শুনুন। চান্দা মাছ এসেছে। এক ঝুড়ি, প্রত্যেকটা দেড় বিঘত সাইজ। এ বাড়িতে আবার অল্প কিছু আসে না। যা আসে ঝুড়িভর্তি আসে...

আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকলাম। জহুরুল সাহেবের গল্পে বাধা পড়ল। আমরা টহল পুলিশের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। ইউনিফর্মের কারণে সব পুলিশ এক রকম মনে হলেও এটি যে গতকালেরই সেই দলটি এতে আমার কোনো সন্দেহ রইল না।

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আসসালামু আলাইকুম, কী খবর?

টহল পুলিশের দল থমকে দাঁড়াল।

আজ আপনাদের পাহারা কেমন চলছে? আজও দেখি আপনাদের সাথে টহলের গাড়ি নেই। ব্যাপার কী?

এই প্রশ্নেরও জবাব নেই। জহুরুল সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। কথাবার্তার ধরন ঠিক বুঝতে পারছেন না।

কালকের বুদ্ধিমান ওস্তাদজি আজও আমার সাথে প্রথম কথা বললেন। তবে আজ কোনো তুই-তোকারি না, ভদ্র ভাষায়।

আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

ভাত খেতে যাচ্ছি। আজ অবশ্য আমি খাব না। এই ভদ্রলোক খাবেন। ওনার নাম জহুরুল আলম। ওনাকে থাপ্পড় দিতে চাইলে দিতে পারেন। উনিও কিছু বলবেন না। উনিও আমার মতোই মজলুম টাইপ।

জহুরুল সাহেব ফিসফিস করে বললেন, ব্যাপারটা কী আব্দুল্লাহ ভাই, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কী সমস্যা?

আমি জহুরুল সাহেবকে নির্ভয় দিয়ে বললাম,

কোনো সমস্যা না। জনগণের সেবক পুলিশ ভাইয়েরা এখন আপনার রাতের খাবারের ব্যবস্থা করবেন ইনশা-আল্লাহ।

পুলিশ দলের একজন বলল, কালকের ব্যাপারটা মনে রাখবেন না। রাত-বিরাতে নানা কিসিমের বদলোক রাস্তায় ঘুরাফেরা করে, নেশা-পানি করে তো, আমরা বুঝতে পারি নাই। একটা মিসটেক হয়ে গেছে।

আমি কিছু মনে করিনি। তবে মনের ভেতর অতি সামান্য খচখচানি আছে, সেটা দূর হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

আচ্ছা আপনারা একটা উপকার করতে পারেন।

জি, বলেন।

আমার এই ভাইটি রাতে কিছু খাননি এখন পর্যন্ত। ওনার জন্যে রাতের খাবারের কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন?

এত রাতে?

পুলিশের কারবারই তো রাতে। আপনাদের একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিই। যেকোনো একটা হোটেলে গিয়ে জহুরুল সাহেবকে দেখিয়ে বিনীতভাবে বলবেন যে, লোকটা সারাদিন ধরে কিছু খায়নি, কিছু একটা ব্যবস্থা করতে। দেখবেন দৌড়ে ঝাঁপটে একটা ব্যবস্থা করবে। মধ্যরাতের পুলিশ খুব ভয়াবহ জিনিস। তবে একটা রিকোয়েস্ট...

জি, বলেন।

টাকা না দিয়ে হোটেল মালিককে ভয় দেখিয়ে ওনাকে খাওয়াবেন না প্লিজ, এতে

পেটে তার খাবার ঢুকবে, কিন্তু হজম হবে না।

জহুরুল সাহেবের হতভম্ব ভাব কাটছে না। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সম্ভবত মাথায় উঠে গেছে। পুলিশ দলের একজন আমার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, স্যার কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট টক আছে।

আমি প্রাইভেট টক শোনার জন্যে ফুটপাথ ছেড়ে নিচে নেমে এলাম। সে কানের কাছে গুনগুন করে বলল, স্যার, বিরাট ভুল করে ফেলেছি আমরা। রাস্তায় কত লোক হাঁটে; কে সাধু, কে শয়তান বুঝব কীভাবে!

আমিও তার মতোই নিচু গলায় বললাম, না বোঝারই কথা।

ওস্তাদ একটা ভুল করেছে। মারাত্মক ভুল করেছে। আপনার মতো একজনকে চড় দিয়ে ফেলেছে। তারপর থেকে ওনার হাত ফুলে প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথার চোটে রাতে ঘুমোতে পারেননি।

বেকায়দায় চড় দিয়েছে। রগে টান পড়ছে বোধ হয় কিংবা হাতের মাস্‌ল-এ কিছু হয়েছে।

কী যে হয়েছে সেটা স্যার আমরা বুঝে গেছি। এখন স্যার আমাদের ক্ষমা করে দিতে হবে, এটা স্যার আমাদের একটা আবদার।

আপনাদের ওস্তাদ আমাকে থাপ্পড় দিয়েছে বলেই যে তার হাত ব্যথা করছে—বিষয়টা তা নয়। কিন্তু হ্যাঁ, তিনি যে আমাকে বিনা অপরাধে থাপ্পড় দিয়েছেন এতে হাক্কুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার হক্ক নষ্ট হয়েছে। হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্ক যদি কেউ নষ্ট করে সেটা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করলে তা আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না যেই বান্দার হক্ক নষ্ট করা হয়েছে সেই বান্দা নিজে ক্ষমা না করেন। বুঝতে পেরেছেন।

জি স্যার।

কত বান্দার হক্ক যে আমি, আপনি, আপনার ওস্তাদজি নষ্ট করেছি! যান সেই অর্থে আমি আপনার ওস্তাদকে ক্ষমা করে দিলাম।

ওস্তাদজি আজ ছুটি নিয়েছে। সারাদিন শুয়েছিল, রাতে বের হয়েছে শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

ভালোই হয়েছে, দেখা হয়ে গেল।

আপনি স্যার আমাদের জন্যে একটু দোয়া রাখবেন।

শত শত মজলুমের বদদোয়ার বিপরীতে আমার দোয়ায় কী কাজ হবে?

লোকটার চোখ পিটপিট করছে, বিরক্ত বোধ করছে। পারলে আরেকটা থাপ্পড় বসিয়ে দিত, কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না তার।

আমি বললাম, আমি দোয়া রাখব আপনাদের জন্যে, অবশ্যই দোয়া রাখব।

লোকটার মুখে হাসি ফুটল।

ওনার খাবারের ব্যাপারে স্যার কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা ওনাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা নিচ্ছি।

আমি জহুরুল সাহেবকে বললাম, আপনি এদের সঙ্গে যান, খাওয়া-দাওয়া করুন। তারপর মেসে চলে যাবেন। আমি ভোরবেলা ফিরব ইনশা-আল্লাহ।

জহুরুল সাহেব পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। কিছুতেই যাবেন না। পুলিশরা বলতে গেলে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল। বেচারার হতাশ দৃষ্টি দেখে মায়া লাগছে। মায়া ভালো জিনিস না। ক্ষণস্থায়ী এই সংসারে মায়া বিসর্জন দেয়া শিখতে হয়। আমি শেখার চেষ্টা করছি। ইস্! জহুরুল সাহেবকে স্রষ্টার সামনে দাঁড়ানো, তাঁর সাথে বাতচিতের বিষয়টা আর বুঝিয়ে বলা হলো না। আমার মনে হয় তিনি জানেন। তিনিও গভীর রাতে তার স্রষ্টার সামনে দাঁড়ান, দুহাত তুলে চোখের পানি ফেলে বাতচিত করেন একাকী।

রাতে তাহাজ্জুতের নামায খুশোখুযোর সাথে লম্বা করে পড়া হচ্ছে না। বিশ মিনিটের সার্কেল থেকে বের হতে পারছি না। এক রাকাতে কয়েকটি সূরা একবারে ধীরে ধীরে পড়লেও ফলাফল একই—বিশ মিনিট। আমার মনে হয়, আমি পদ্ধতিগত ভুলে আছি। সময় ধরে নামায ঠিক করতে চাইলে তাতে যা-ই হোক, নামায ঠিক হচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না। চিন্তা করেছি সময় ধরে এভাবে আর করব না; বরং বড় সূরাগুলো মুখস্থ করতে হবে। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার নাকি সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা এক রাকাতে পড়েছিলেন—আল্লাহু আকবার। এ রকমভাবে শুধু একটা বড় সূরা পড়তে পারলেই রাতের নামাযে আল্লাহর সাথে আরও মধুর সময় কাটানো যেত। এখন তাই রাতে বেশি জেগে থাকছি না। দিনে সূরা বাকারা মুখস্থ করার একটা প্রচেষ্টা নিয়েছি। রাতে অল্পস্বল্প নামায পড়ছি। ঘুমিয়ে পড়ছি। দিনে সূরা মুখস্থ করছি। একটু টায়ার্ড লাগলে হাঁটতে বের হচ্ছি। হেঁটেহুটে আবার এসে পড়ছি। দিনে হাঁটাহাঁটি করার মধ্যেও কিছু থ্রিল আছে। হঠাৎ হঠাৎ খুব বিপজ্জনক কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যার সঙ্গে নিশিরাতে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। রাত তিনটার সময় নিশ্চয়ই রাহেলা খালার সাথে নিউমার্কেটের কাছে দেখা হবে না। প্রায় দু-বছর পর রাহেলা খালার সঙ্গে দেখা। তিনি বসে আছেন পাজেরো নামের অভদ্র গাড়ির ভেতরে পেছনের সিটে। তার মাথায় কাপড়। তিনি মাথায় কাপড় দিয়ে চলবেন ভাবাই যায় না। অবশ্য আমাকে দেখে মাথায় কাপড় চড়াতে পারেন। ইদানীং আমার পরিবর্তন সম্পর্কে প্রায় সবাই জেনে গেছে মনে হয়।

রাহেলা খালা হাত উঁচিয়ে ডাকলেন, এই সুবোধ এই...। ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। আমি কী করি? আমার উচিত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া, কোনো গলিটলির ভেতরে ঢুকে পড়া। গলি না থাকলে ম্যানহোলের ঢাকনি খুলে তার ভেতরে সেঁধিয়ে

যাওয়া। কিছু কিছু ট্রাকের পেছনে লেখা থাকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। রাহেলা খালা সেই ট্রাকের চেয়েও ভয়াবহ। নিজেকে এখন অসহায় লাগছে। আশেপাশে কোনো গলি বা ম্যানহোল খুঁজে পাচ্ছি না। কাজেই বাধ্য ছেলের মতো আমি হাসিমুখেই রাহেলা খালার দিকে এগিয়ে গেলাম। রাস্তা পার হবার আগেই খালা চেঁচিয়ে বলল, সুবোধ তুই নাকি গলার কাঁটা নামাতে পারিস?

ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশ-ঊর্ধ্ব হলেও এ মুহূর্তে খুকি সেজে আছেন। আমাকে দেখেই হোক বা যে কারণেই হোক মাথায় বড় করে কাপড় টেনে দিয়েছেন। এই বয়সের মহিলারা খুকি সেজে বের হলে বেশ বেমানান লাগে।

আমি গাড়ির কাছে চলে এলাম। রাহেলা খালা চোখ বড় বড় করে বললেন, অভির মায়ের কাছে তোর অলৌকিক ঘটনা শুনলাম। বড় বড় ডাক্তার কাত হয়ে গেছে। তুই গিয়েই মন্ত্রতন্ত্র পড়ে কাঁটা নামিয়ে ফেললি। কিরে সত্যি নাকি?

না খালা, এক বিন্দুও সত্যি না।

সত্যি না। তাহলে কি তোর ফুপা-ফুপু মিথ্যা বলছে। আমার সাথে ফাজলামো করিস।

না ফাজলামি করছি না।

চুপ থাক বেয়াদব কোথাকার। একদম মিথ্যা কথা বলবি না। শোন, তোকে আমি হারিকেন দিয়ে খুঁজছিলাম। তোর ঠিকানা কী? কোনো ভিজিটিং কার্ড আছে?

ঠিকানাই তো ঠিক নেই আমার আপাতত, আবার ভিজিটিং কার্ড!

তুই এক কাজ কর না। আমার বাড়িতে চলে আয়। একতলায় ঘরগুলো তো একদম খালিই পড়ে থাকে। তুই একটা ঘরে থাকবি। আমার সঙ্গে খাবি। আরামে জীবনধারণ করবি। ফ্রি থাকা-খাওয়া। আর কী লাগে।

হুম। দেখি চলে আসতে পারি।

আসতে পারি টারি না। চলে আয়। তুই কাঁটা নামানো ছাড়া আর কী কী করতে পারিসরে?

আপাতত কিছুই পারি না।

কে যেন ওইদিন তোর সম্পর্কে বলছিল, তুই নাকি ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলতে পারিস। তোর সিক্সথ সেন্স নাকি খুব ডেভেলপড।

আমি হাসলাম।

হাসিটা মনে হলো রাহেলা খালাকে আরও অভিভূত করল।

এই সুবোধ, গাড়িতে উঠে আয়।

আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

কোথাও যাচ্ছি না। খালি বাড়িতে থাকতে কতক্ষণ আর ভালো লাগে। এই জন্যেই গাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে বের হয়ে, এইভাবে আরাম করে ঘুরে বেড়াই।

বাড়ি খালি নাকি?

ও আল্লাহ, তুই কিছুই জানিস না দেখছি? তোর খালুর ইন্তেকালের পর বাড়ি তো পুরাই খালি! এত্ত বড় বাড়িতে একা থাকি, অবস্থাটা চিন্তা করতে পারিস।

তোমাদের যে রাজপ্রাসাদ। ট্যাঁ ট্যাঁ দারোয়ান, মালি, ড্রাইভার এরা তো নিশ্চয়ই আছে।

খালি বাড়ি কি দারোয়ান, মালি, ড্রাইভার এসবে ভরে? তুই একটু কাজ কর। আমার বাসায় চলে আয়। তোর কাঁটা নামানোর ক্ষমতার কথা শুনে দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে।

খালা আমার কোনো ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা আল্লাহর। অভির গলায় কাঁটা বিঁধেছে, অভি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছে। আল্লাহ সারিয়ে দিয়েছেন।

ভণিতা করিস না তো সুবোধ। তুই সত্যিই কাঁটা নামাতে পারিস, এখন আমি এক শ ভাগ শিওর হলাম। যারা পারে তারা ক্রেডিট নেয় না। কথা না বলে গাড়িতে উঠে আয়।

এইভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? গাড়িতে উঠে আয় এখনই।

আজ তো খালা যেতে পারব না। জরুরি কাজ আছে।

তোর আবার কিসের জরুরি কাজ, মাসজিদের বারান্দায় বারান্দায় পরে থাকা ছাড়া তোর আবার কাজ কী?

খালাকে বলা যাচ্ছে না সূরা বাকারা মুখস্থ করার বিষয়টা। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটাকে তার কাছে গুরুত্বহীন মনে হবে। আজকাল মুসলিম নামধারী প্রায় সবার কাছেই কুরআন মুখস্থ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজকে গুরুত্বহীনই মনে হয়। আমি একটু রহস্য করে বললাম, আছে খালা, অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ আছে। দুই দুনিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি।

কী বলছিস এসব?

জি খালা।

খালা খানিকটা ভড়কে গেছে। দুই দুনিয়া বলতে সে কী বুঝেছে আল্লাহই ভালো জানেন, তবে স্বস্তির ব্যাপার হলো এখন আর তার বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমায় টানাহ্যাঁচড়া করছে না।

আচ্ছা ঠিক আছে, আমার বাসায় থাকতে না চাইলে না থাকবি। গাড়িতে ওঠ, তোকে কিছুদূর এগিয়ে দিই। রোদের মধ্যে হাঁটছিস দেখে মায়া লাগছে।

কেউ গাড়িতে ওঠার জন্যে বেশি রকম পীড়াপীড়ি করলে ধরে নিতে হবে, গাড়িখানা নতুন কেনা হয়েছে। আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, গাড়ি নতুন কিনলে?

নতুন কোথায়, ছয়-সাত মাস হয়ে গেল না।

ছয় মাসে হাসবেন্ড-ওয়াইফের সম্পর্ক পুরোনো হয়, গাড়ি হয় না। তোমার গাড়িটা চমৎকার হয়েছে।

তোর পছন্দ হয়েছে?

আলবত পছন্দ হয়েছে! ছোটখাটো একটা অ্যারোপ্লেনের মতো লাগছে।

এই গাড়ির সবচেয়ে বড় সুবিধা কি জানিস? সামনা-সামনি কলিশন হলে এই গাড়ির কিছুই হবে না, কিন্তু অন্য গাড়ি চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

বাহ্, ব্যাপক ব্যাপার তো!

তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগছেরে সুবোধ। চাকরি-বাকরি কিছু করছিস?

না আপাতত কিছু করছি না। কেন? আপনার হাতে চাকরি আছে?

না। তোর খালুর মৃত্যুর পর মিল-টিল সব বিক্রি করে ক্যাশ টাকা করে ফেলেছি অনেক। এখন চিন্তা করছি ব্যাংকে রাখব। আমি একা মানুষ; মিল-টিল চালানো তো আর আমার পক্ষে সম্ভব না। সবাই লুটেপুটে খাবে; দরকার কী?

ব্যাংকে রাখলে তো সুদ হবে। আর সুদ খাওয়া তো হারাম খালা। তুমি এখন সুদ খেলে পরে তো রক্তপুঁজ এগুলো খেতে হবে।

তুই গেরুয়া পাঞ্জাবি ছেড়ে খয়েরি জোব্বা ধরার পর থেকে তোর কথাবার্তা বদলে গেছেরে সুবোধ।

শুধু কথাবার্তা না খালা, আমার নামও বদলে গেছে। আমার নাম কিন্তু এখন আর সুবোধ নেই। আমার নাম আব্দুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর গোলাম।

তোকে কি আমারও এখন আব্দুল্লাহ নামে ডাকতে হবে।

হ্যাঁ খালা। ডাকতে হবে। তুমি সেই কখন থেকে সুবোধ, সুবোধ করছ। বিরক্ত লাগছে।

আচ্ছা ঠিক আছে আর সুবোধ বলে ডাকব না তোকে। এখন খুশি তো।

হ্যাঁ খুবই খুশি।

গাড়ি চলছে...। কোনো বিশেষ দিকে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ড্রাইভার তার ইচ্ছেমতো গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। মিরপুর রোড ধরে চলতে চলতে ফট করে ধানমন্ডি চার নম্বরে ঢুকে পড়ল। আবার কিছুক্ষণ পর মীরপুর রোডে চলে এল।

আব্দুল্লাহ।

জি খালা।

তোর খালুর স্মৃতি রক্ষার্থে একটা কিছু করতে চাই। বেশ কর্মোদ্যমী পুরুষ

ছিল। পথের ফকির থেকে নানা রকম কায়দা কানুন করে সে শিল্পপতি হয়েছিল। কলকারখানা, গার্মেন্টসসহ জীবনে অনেক কিছুই করে গেছেন। স্ত্রী হিসেবে তার স্মৃতি রক্ষার জন্যে আমার তো কিছু করা দরকার, তাই না।

তা তো ঠিকই। তার জন্যে কিছু করলে তো ভালোই।

হুম তার জন্যে আমার অবশ্যই কিছু করা দরকার। ভালো কিছু করা দরকার। ওনার নামে একটা আর্ট মিউজিয়াম করলে কেমন হয়রে?

খালু সাহেবের নামে এই ধরনের আর্ট মিউজিয়াম করা যাবে না। ব্যাপারটা খেত হয়ে যাবে। তার নামের সাথে মানাবে না।

মানাবে না কেন?

'গগন আলী মিয়া মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট' শুনতে ভালো লাগছে না। খালু সাহেবের নামটা গগন আলী মিয়া না হয়ে আরেকটু সফিস্টিকেটেড কোনো সুন্দর নাম হলে মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট টাইপ একটা আধুনিক নাম দেয়া যেত।

গাড়ি মিরপুর রোড থেকে আবার ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে ঢুকে পড়েছে। আবারও মনে হয় মিরপুর আসবে। ভালো যন্ত্রণায় পড়ে গেলাম।

খালা, এখন আর তোমার সাথে ঘোরাঘুরি করতে পারব না। আমার এখন যাওয়া দরকার।

আহ্ বস না। অনেক দিন পর তোর সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগছে। কথা বলার মানুষই তো পাই না। কোনো আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আমার বাড়িতে আসে না। এটা একটা আশ্চর্য কাণ্ড। তোর খালুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কার্ড ছাপিয়ে পাঁচ শ লোককে দাওয়াত দিয়েছি। তিন তিনটা দৈনিক পত্রিকায় কোয়ার্টার পেইজে বিজ্ঞাপন দিলাম। লোক কত হয়েছে বলত?

এক শ জন হয়েছে না?

আরে না, আঠারো জন। এর মধ্যে আমার নিজের লোকই সাত জন। ড্রাইভার, দারোয়ান, কাজের দুটা মেয়ে।

আমাকে তো তুমি একবারও খবর দিলে না?

তোকে খবর দেবো কীভাবে? তোর কি কোনো স্থায়ী ঠিকানা আছে? রাস্তায় যে ফকিরগুলো আছে তাদেরও একটা ঠিকানা থাকে। রাতে তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুমায়। কমলাপুর রেল স্টেশনে যে ঘুমোবে সে সেখানেই ঘুমোবে। সে ফার্মগেটের ফুটওভার ব্রিজের ওপর গিয়ে ঘুমোবে না। আর তুই তো আজ এই মেসে, কাল ওই মেসে। তার চেয়ে শোন আব্দুল্লাহ, তুই চলে আয় তো আমার কাছে। গুলশানের বাড়ি নতুন করে রিনোভেট করেছি। একদম নতুন আঙ্গিকে পরিবর্তন করেছি। টাকা-পয়সা খরচা করে হুলুস্থুল করেছি। তোর ভালো লাগবে। আসবি?

সবই কি সুদের টাকায় করা?

না, আমাদের ঘরের সিন্দুকে তোর খালু সাহেব যে পরিমাণ ব্যবসায়ের মুনাফার টাকা রেখে গিয়েছিল সেগুলোই খরচ করে এখনো শেষ করতে পারছি না। সুদের টাকা এখনো জমছে। সেগুলোতে হাত দিচ্ছি না। তুই ভয় পাস না। তুই এলে সুদের টাকা তোকে খেতে হবে না। আসবি?

চিন্তা করে দেখি খালা।

এত চিন্তা করতে হবে না, তুই চলে আয়। থাকা-খাওয়ার খরচের হাত থেকে তো বেঁচে গেলি। মাঝে মাঝে না হয় কিছু হাতখরচও নিবি।

তাহলে তো ভালোই হয়, মা শা আল্লাহ। কত দেবে হাতখরচ?

চা-পানের খরচ আর কি। কি, থাকবি? তুই থাকলে একটা ভরসা হয়। দিনকালের যে অবস্থা। চাকর-দারোয়ান এরাই চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে কোন দিন না মেরে ফেলে। এমন ভয়ে ভয়ে থাকি। চলে আয় আব্দুল্লাহ। আজই চলে আয়।

হু। দেখি।

তোকে দেখে আরেকটা কথা ভাবছি। বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা আছে, প্যারানরমাল পাওয়ার যাদের, এদের বাড়িতে এনে রাখলে কেমন হয়? অ্যাস্ট্রোলজার, পামিস্ট, ব্ল্যাকম্যাজিক করে এমন মানুষ। বুঝতে পারছিস কি বলছি?

হু পারছি, ইন্সটিটিউট অব সাইকিক রিসার্চ টাইপ কিছু।

ঠিক বলেছিস বাংলাদেশে তো এ রকম আগে হয়নি, নাকি হয়েছে?

না তা হয়নি। তবে এই জিনিস করলে তোমার নামে করতে পারো। খালু সাহেবের নামে এসব করা অর্থহীন। তোমার এসব কর্মকাণ্ডের জন্যে ওপারে বেচারার ওপরে স্টিম রোলার চলতে পারে। খালু সাহেবের জন্যে কিছু করতে চাইলে মাদ্রাসা টাইপের কিছু করতে পারো। এতিম কিছু ছেলেপুলে বড় হয়ে ডাকাত, খুনি না হয়ে বরং আলেম হবে। দীনের আলো ছড়াবে। তোমাদের জন্যে দোয়া করবে। এপার থেকে নিয়ম করে ওই পারে সওয়াব ট্রান্সফার করা হবে, খালু সাহেবও ওপারে পায়ের ওপর পা তুলে সওয়াব নিতে থাকবে। ব্যাংকে টাকা রেখে যেমন সুদ খেতে চাচ্ছ ব্যাপারটা অনেকটা সে রকম। এখানে ইনভেস্ট করে ওখানে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে নেও। খালা এখানে আমি নামব। ড্রাইভারকে বলো গাড়ি থামাতে।

আরেকটু বস না।

প্রশ্নই আসে না। ড্রাইভার গাড়ি থামাও। গাড়ি না থামালে আমি জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ব।

ড্রাইভার গাড়ি থামাল। রাহেলা খালা বলল, কি ঠিক হলো? তুই আসছিস তো?

হু আসতে পারি, দেখা যাক। আমার এ মাসের হাতখরচের টাকাটা দিয়ে দাও।

থাকাই শুরু করলি না। হাতখরচ কিসের?

এটা তো খালা কোনো চাকরি না যে মাসের শেষে বেতন পাব। এটা তো খালা হাতখরচ।

তুই আগে বিছানা-বালিশ নিয়ে উঠে আয়, তারপর দেখা যাবে।

আচ্ছা।

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলা শুরু করলাম, উদ্ধার পাওয়া গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এখন চেষ্টায় আছি যত দ্রুত সরে পড়া যায়। সম্ভাবনা খুব বেশি যে, খালা তার গাড়ি নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসবেন। আমার উচিত ছোট কোনো গলিতে ঢুকে পড়া, যেখানে পাজেরো টাইপ গাড়ি ঢুকতে পারে না।

এই আব্দুল্লাহ, এই। এক সেকেন্ড শুনে যা, এই... এই।

বধির হয়ে যাওয়ার ভান করে আমি গলি খুঁজছি। গাড়ির ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ন

দিচ্ছে। না ফিরলে চারদিকে লোক জড়ো হয়ে যাবে। বাধ্য হয়ে ফিরলাম।

নে, হাতখরচ নে। না দিলে আবার হাত খরচ দেয়া হয়নি এই অজুহাতে আসবি না।

রাহেলা খালা একটা এক হাজার টাকার চকচকে নোট জানালা দিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

তুই সন্ধ্যায় চলে আসিস। সন্ধ্যার পর থেকে আমি বাসায় থাকি। বিভিন্ন রকম সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বুঝলি। ভয়ংকর সব ব্যাপার ঘটেছে আমার আশেপাশে। খুব বিশ্বস্ত কাউকে বলা দরকার। রাতে এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারি না।

চলে আসব দেখি ইনশা-আল্লাহ।

টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, পকেটে রাখ। হারিয়ে ফেলবি তো।

খালা আমার পকেট নেই। যাবতীয় টাকা-পয়সা আমাকে হাতে নিয়ে ঘুরতে হয়।

কী বলছিস এসব?

আমি কথার উত্তর না দিয়ে মিহি করে হেসে বললাম,

খালা যাই?

যাই বলে দেরি করলাম না। প্রায় দৌড়ে এক গলিতে ঢুকে পড়লাম।

আচ্ছা টাকা কি কেউ হাতে নিয়ে ঘোরে? কিছু কিছু প্রফেশনের লোকজন টাকা হাতে নিয়ে ঘোরে। বাসের কন্টাক্টররা টাকা হাতে রাখে। কিছু কিছু ভিক্ষুক টাকা হাতে রাখে। আর কেউ? এক হাজার টাকার চকচকে একটা নোট হাতে রাখতে বেশ ভালোই লাগছে। নোটটা এতই নতুন যে, ভাঁজ করতে ইচ্ছে করছে না। চনমনে রোদ ওঠায় কিঞ্চিৎ গরম লাগছে। নোটের সাইজটা আরেকটু বড় হলে টাকা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে যাওয়া যেত।

খালার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি আগারগাঁওয়ে। সেখান থেকে কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। হেঁটে হেঁটে মিরপুর রোডে উঠে নিউমার্কেটে চলে যাওয়া যায়। ইচ্ছে করলে মোহাম্মাদপুরের ভেতর থেকে রিকশা নিয়ে যেতে পারি। ভাড়া দেয়া

সমস্যা হবে না।

আমি খুঁজছি একটি রিকশা যেটায় করে কিছু দূর গিয়ে সেই রিকশার চালককে ভাড়া হিসেবে পুরো টাকাটা দিয়ে দেবো। এর জন্যে একজন বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা দরকার। এমন বুড়ো রিকশাওয়ালা—যে কবরে এক পা দিয়ে রেখেছে, যাদের রিকশায় সহজে কেউ চড়ে না, এমন কেউ যে রিকশা ঠিকমতো টানতেও পারে না। বয়সের ভারে কানেও ঠিক শোনে না। গাড়ির সামনে হঠাৎ রিকশা নিয়ে উপস্থিত হয়। এসব রিকশায় চড়া মানে পদে পদে বিপদের মধ্যে পড়া। যেহেতু রাহেলা খালার বাড়িতে আমার থাকতে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। সেহেতু এই এক হাজার টাকা নিজের জন্যে খরচ করব না; বরং এই টাকা কোনো একটা সৎকর্মে ব্যয় করতে হবে।

ভাড়া হিসেবে পুরো নোটটা কোনো এক বৃদ্ধ রিকশাওয়ালাকে দিয়ে দিলে সাধারণ মানের একটা সৎকর্ম করা হবে।

পছন্দসই কোনো রিকশাওয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না। বুড়ো রিকশাওয়ালা কেউ নেই। বুড়োরা আজ কেউই রিকশা বের করেনি। আসাদ গেটে এসে একজনকে পাওয়া গেল, চলনসই ধরনের বুড়ো। রিকশার সিটে পা এর ওপর পা উঠিয়ে বসে চায়ে বনরুটি ভিজিয়ে খাচ্ছে। সকালের ব্রেকফাস্ট বোধ হয় না। বারোটার মতো বেজে গেছে। রিকশাওয়ালারা এত দেরিতে নাস্তা করে না। তারা নাস্তা করে রিকশা নিয়ে বের হবার আগে। লাঞ্চও হবার সম্ভাবনা কম। বোধ করি প্রি লাঞ্চ।

চাচা মিয়া যাবেন?

বুড়ো প্রায় ধমকে উঠলেন—না। খাওয়ার মাঝখানে বিরক্ত করায় সে সম্ভবত খেপে গেছে।

কাছেই যাব। বেশি দূরে না। নিউ মার্কেট। নিয়ে যান না।

ওই দিকে যামু না।

ফার্মগেট যাবেন? ফার্মগেট গেলেও আমার চলে।

যামু না কইলাম না।

যাবেন না কেন?

ইচ্ছা করতাছে না, যামু না।

আমি নাহয় অপেক্ষা করি, আপনি চা শেষ করেন তারপর যাব। ফার্মগেট যেতে না চান তাও সই। অন্য যেখানে যেতে চান যাবেন। আমাকে কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।

মনে হলো আমার এই প্রস্তাব তার মনে ধরেছে। কিছু না বলে চা-বনরুটি শেষ করল। লুঙ্গির ভাঁজ থেকে বিড়ি বের করে আয়েশ করে বিড়ি টানতে লাগল। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি। বিড়ি খাওয়ায় বাধা দেয়া উচিত। সেটা এই মুহূর্তে দিলাম না। রিকশায় উঠি, তারপর সময় নিয়ে বলতে হবে। কাউকে দান করতে যাওয়াও সমস্যা। দান করতেও ধৈর্য লাগে। হুট করে দান করা যায় না। বুড়ো বিড়ি টানা শেষ করে রিকশার সিট থেকে নামল। আমি উঠতে যাচ্ছি, সে গম্ভীর গলায় বলল, কইছি না যামু না। ত্যক্ত করেন ক্যান?

আমি বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলাম। সে খালি রিকশা টেনে বেরিয়ে গেল। একটু সামনে গিয়ে দুজন যাত্রীও নিল। যেকোনো কারণেই হোক আমাকে তার পছন্দ হয়নি। এক হাজার টাকার চকচকে নোটটা তাকে দেয়া গেল না। আসলে আল্লাহ যার রিজিকে এই হাজার টাকার নোটটা রেখেছেন তার হাতেই এই নোট পৌঁছে যাবে, সেটা যেমন করেই হোক। আল্লাহ প্রদত্ত রিজিকের ব্যাপারটা যে কত ইন্টারেস্টিং তা কিছুটা চোখ-কান খোলা রেখে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়।

আমি ফার্মগেটের দিকে রওনা হলাম। নানা কিসিমের অভাবী মানুষ ওই জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ভিক্ষার বিচিত্র টেকনিক দেখতে হলে ফার্মগেটের চেয়ে ভালো কোনো জায়গা হতে পারে না। একবার একজনকে পেয়েছিলাম—ইংরেজিতে ভিক্ষা করেন।

'Sir, I am a very poor man,

I have two sons and three doughters.

They are studying, and I don't have any money.

I am jobless. Help me please.

আমি বললাম, ইংরেজিতে ভিক্ষা করে কী আরাম হয় ভাই? যেই ভাষার জন্যে বাঙালিরা প্রাণ দিলো, সেই ভাষা রেখে বিজাতীয় ভাষায় ভিক্ষা করছেন এটা কেমন কথা। বাঙালিরা কি প্রাণ দিয়েছে ইংরেজি ভাষায় ভিক্ষা করার জন্য? ভিক্ষার জন্যে

বাংলার চেয়ে ভালো ভাষা আর হতেই পারে না।

ইংরেজি ভাষার ভিক্ষুক নাক-মুখ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, ফেব্রুয়ারি মাস তো ভাষার মাস। এই মাসেও কি ইংরেজিতে ভিক্ষা করেন, নাকি তখন বাংলা ভাষায়?

আরেকজন আছেন বেশ ভদ্র চেহারা। ভদ্র পোশাক। আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত একজন নিতান্ত ভদ্রলোক। তিনি এসে খুবই আদবের সঙ্গে মিষ্টি গলায় বলেন, ভাই কিছু মনে করবেন না, সময়টা কি একটু জানতে পারি? এখন কয়টা বাজে? আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।

যাকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ভদ্রলোকের ভদ্রতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। ঘড়ি দেখে সময় বলেন।

অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আজকাল মানুষ কারও কোনোপ্রকার উপকারই করতে চায় না। ইদানীং এমন হয়েছে যে, সময় জিজ্ঞেস করলেও মানুষজন রেগে যায়।

না না ঠিক আছে।

তখন ভদ্রলোক গলা নিচু করে বলেন, ভাই সাহেব, একটা মিনিট সময় হবে? দুটা কথা বলতাম।

যে সময় দিয়েছে সে-ই ফেঁসেছে। তার বিশ-পঁচিশ টাকা খসবেই।

আরেকজন ভদ্রলোককে মাঝে মাঝে দেখা যায়। খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা। দাড়ি ওয়েল শেইভড। শুধু নাকের নিচে বিশাল গোঁফ তেলাপোকার মতো গিজগিজ করছে, হাতে বেনসনের প্যাকেট, পাঁচ আঙুলে নানা পাথরের আংটি। সারাক্ষণ পান চাবাতে থাকেন। ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির পকেটে সম্রাট আকবরের সময়কার একটা মোহর। দেড় ভরির মতো ওজন। তার গল্প হচ্ছে—তিনি এ রকম মুদ্রাভর্তি একটা ঘটি পেয়েছেন কোন এক পুকুর কাটতে গিয়ে। কাউকে জানাতে চাচ্ছেন না। জানালে সরকার সিজ করে নিয়ে যাবে। তিনি গোপনে মুদ্রাগুলো বিক্রি করতে চান। তবে খুব সস্তায় না। কারণ, খাঁটি সোনার মোহর। সোনার যা দাম সেই হিসেবে কিনতে হবে, তিনি যেহেতু বিপদে আছেন সেহেতু কিছুটা ছাড় তিনি দেবেন। ভদ্রলোকের মূল ব্যবসার জায়গা ফার্মগেট না। ফার্মগেটে তিনি মাঝে মাঝে আসেন। এবং অন্য

কোনো উদ্দেশ্যে আসেন। উদ্দেশ্যটা আমার কাছে তেমন পরিষ্কার না। ফার্মগেটে যে সকল ভিক্ষুকদের আমি চিনি, আজকে তাদের কাউকেই পেলাম না। তবে আশ্চর্যজনকভাবে আব্দুর রাহমানকে পেয়ে গেলাম। চশমা দেখে চিনলাম। চশমার ডাঁট নেই, সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। হাতে একতাড়া কাগজ নিয়ে এর ওর কাছে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন। হলুদ রঙের বড় একটা খামও আছে। নির্ঘাত রোগীর নানা রকম রিপোর্ট।

আব্দুর রাহমান সাহেব না? কেমন আছেন? চিনতে পেরেছেন?

ভদ্রলোক চশমার আড়াল থেকে পিটপিট করে তাকাচ্ছেন। চিনতে পেরেছে কি না সেটা তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

আমি তার চশমার ডাঁট ঠিক করিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি আবার চশমার ডাঁট ফেলে দিয়ে সুতো লাগিয়েছে।

আমি হাসিমুখে বললাম

চশমার ডাঁট ফেলে দিয়ে আবার সুতো লাগিয়েছেন? এতে কি ভিক্ষার সুবিধা হয়?

আপনাকে চিনতে পারছি না।

চিনবেন না কেন? আমি জহুরুল সাহেবের বন্ধু। আপনার হাতে কী? প্রেসক্রিপশন? এত পুরোনো টেকনিকে গেলেন কেন?

আব্দুর রাহমান কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ছেলে মরণাপন্ন। লাংসে পানি জমেছে। প্লুরিসি। প্রফেসর রহমান ট্রিটমেন্ট করছেন। বিশ্বাস না হলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১২ নং ওয়ার্ডে যেতে পারেন।

অবস্থা খারাপ?

আব্দুর রাহামান জবাব দিলেন না। তার কিছু একটা মনে পড়ে গেছে। সে ক্রূরদৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন।

আমি বললাম, টাকা-পয়সা কিছু জোগাড় করতে পেরেছেন?

তা দিয়ে আপনার দরকার কী?

দরকার আছে। আমি এক কাপ চা খাব। চা এবং জর্দা ছাড়া একটা পান। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

হাতে এক হাজার টাকার নোট তো আছে।

হু আছে, এটা দিয়ে খেতে চাচ্ছি না। এই টাকার ব্যাপারে অন্য নিয়ত করে ফেলেছি। খাওয়াবেন এক কাপ চা? আপনার কাছে আমার চা পাওনা আছে। ওই দিন আপনাকে চা-সিঙ্গারা খাইয়েছিলাম।

আব্দুর রাহমান চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন?

সিঙ্গারা খাওয়ান। তাহলে শোধ হয়ে যাবে। আপনি আমার কাছে ঋণী থাকবেন না, আমিও ঋণী থাকব না।

চায়ের সঙ্গে সিঙ্গারাও এল। আমি গলার স্বর নামিয়ে বললাম, আব্দুর রাহমান সাহেব ভিক্ষার একটা নতুন টেকনিক আপনাকে শিখিয়ে দিই। কী, দেবো?

আব্দুর রাহমান সাহবে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। তার চোখ-মুখ কঠিন। আমি খানিকটা ঝুঁকে এসে বললাম। এই পুরোনো টেকনিকে আর কতদিন, ইনকাম কি হয়?

গলায় চা আটকেছে মনে হলো আব্দুর রাহমান সাহেবের, তিনি কাশছেন।

আপনাকে এখন আমি সহজে ইনকামের দুটা ইফেক্টিভ টেকনিক শিখিয়ে দেবো। একটা ভিক্ষার টেকনিক, আরেকটা ভিক্ষার থেকেও সহজে উপার্জনের টেকনিক।

আব্দুল্লাহ ভাই কলা খাবেন, এই দোকানে ফ্রেশ চম্পা কলা পাওয়া যায়।

আমি খুশি খুশি ভঙ্গিতে চম্পা কলা ছিলে কামড় দিচ্ছি। স্বাদ ভালো আলহামদুলিল্লাহ।

আব্দুর রাহমান অবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

ভিক্ষার থেকে সহজ পদ্ধতিও আছে নাকি?

আলবত আছে। দেখি, আপনার কাছে বিক্রি করার মতো কিছু আছে?

না, আব্দুল্লাহ ভাই।

কিছুই নেই?

এই অষ্টধাতুর আংটিটা আছে। ভুজুংভাজুং বুঝিয়ে আমার কাছে তিন শ টাকায় বিক্রি করেছিল।

ঠিক আছে এই আংটিটা আমার কাছে বিক্রি করে দিন।

এটা দিয়ে আপনি কী করবেন?

সই সই খেলব।

নিয়া যান আপনারই আংটি।

আমি আংটিটা হাতে নিলাম। তারপর আমার হাতের এক হাজার টাকার নোটটা তার হাতে দিয়ে বললাম,

সামনে মা ফার্মেসি আছে। সেখানে গিয়ে চাইনিজ একটা ব্লাড সুগার মাপার মেশিন কিনবেন। এই টাকার সাথে আরও অল্প কিছু টাকা হয়তো লাগবে। তারপর রাস্তার পাশে বসে যাবেন। পথচারীদের ব্লাড সুগার মেপে দেবেন। মার্কেট বুঝে টাকা নেবেন। আজকাল প্রায় সবার ডায়াবেটিস। ব্যবসাটা ভালো জমবে ইনশা-আল্লাহ।

আব্দুর রাহমান সাহেবের ভ্রু কুঁচকে আছে।

আমি তার অষ্টধাতু আংটি নিয়ে হাঁটা ধরলাম। সিটি কর্পোরেশনের দেয়া নতুন ডাস্টবিনে ফেলতেই টুং করে শব্দ হলো। তাকে ভিক্ষার সহজ টেকনিকটা আর বলা হলো না। আসার সময় অবশ্য আরেকটা চম্পা কলা ছিঁড়ে নিয়ে এলাম। কলাটা সুস্বাদু। আলহামদুলিল্লাহ।

রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে যখন এক সাহাবি দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতার অভিযোগ করল তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দুটি দিরহাম দিয়ে একটি দিয়ে খাবার কিনে নিতে আর অপরটি দিয়ে একটি কুড়াল কিনতে আদেশ করেছিলেন। তিনি তাকে লাকড়ি কেটে বাজারে বিক্রি করতে বলে দিয়েছিলেন। সেই সাহাবি লাকড়ি কেটে বিক্রি করে অল্পদিনেই স্বাবলম্বী হয়ে গিয়েছিল। আসলে হালাল রিজিকে বারাকাহ থাকে, ব্যাপক বারাকাহ।

ম্যানেজার নবাব জমির আলী আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় বললেন, স্যার সকাল থেকে আপনার জন্যে একটা ছেলে অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিল, শেষে আমি আপনার ঘর খুলে দিলাম।

আমাকে না জিজ্ঞেস করে ঘর খুলে দিলেন কেন?

না মানে ভদ্রগোছের মনে হলো, আঠারো উনিশ বছর বয়স। কতক্ষণ এর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে?

নাম কী ছেলের?

নাম জিজ্ঞেস করা হয় নাই স্যার। চেহারা ছবি ভালো মা শা আল্লাহ।

অভি নাকি? অভি হবার সম্ভাবনা খুবই কম। সে এসে দীর্ঘ সময় ঘরে বসে থাকবে না। নামায পড়তে বাইরে যাবে। আর যাওয়ার সময় নিজ থেকেই ম্যানেজারকে তার নাম বলবে। তাহলে কে হতে পারে?

ঘরে ঢুকে দেখি অভিদের বাসায় যে ক্লিন শেভ্ড ছেলেটিকে দেখেছিলাম—সে। পদার্থবিদ্যার ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। সেরাম না জানি ইরাম নাম।

আমি খুব সহজভাবে ঘরে ঢুকে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য না হওয়ার ভান করে বললাম, কী খবর ইরাম, ভালো?

ইরাম বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। কিছু বলল না। তার মুখ কঠিন। ভ্রু কুঁচকে আছে। বড় ধরনের ঝগড়া শুরু করার আগে মানুষের চেহারা এ রকম হয়ে যায়।

আমার এখানে এলে কী মনে করে? অভির মতো তোমারও কি গলায় কাঁটা

বিঁধেছে?

আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে, আমি সেই সকাল এগারোটা থেকে বসে আছি।

তাহলে তো অনেকটা সময় তোমার অপেক্ষা করতে হলো। আচ্ছা বসো, তারপর বলো কী কথা।

আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল যে, আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলবেন।

আমার একদম মনে থাকে না। কোনো কোনো মানুষকে প্রথম থেকেই এত আপন মনে হয় যে, শুধু তুমি বলতে ইচ্ছে করে। একদম নিজের ছোট ভাইয়ের মতো লাগে।

আমার সামনে মহামানব সাজতে হবে না। এসব ভাবের কথা বাদ দিন, আমি অভি নই।

আচ্ছা।

আপনাদের মতো ভণ্ডদের আমি চিনি। আপনার এই ভণ্ডামি দেখতে আমি আসিনি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে। আমি কথাগুলো বলে চলে যাব।

অবশ্যই। একটু বসুন, ঠান্ডা হন, দরকার হলে এক কাপ চা খান। রাজু নামের এক ছেলে আছে এলাকায় চা-কফি ফেরি করে বেড়ায়। ওকে ডাকি, চা দিতে বলি।

চা-কফি খেতে আমি আসিনি।

আচ্ছা অসুবিধা নেই। চা খাওয়া লাগবে না। আপনি একটু ঠান্ডা হয়ে বসুন, তারপর বলুন।

ইরাম বসল না, দাঁড়িয়েই রইল। সে গম্ভীর মুখে বলল,

কথাটা হচ্ছে, অভিদের বাড়িতে যে কাজের বুয়া আছে—তার একটা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল।

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লুতফা নাম।

সে নাকি আপনাকে বলেছিল তার মেয়েকে খুঁজে দিতে।

হ্যাঁ বলেছিল, এখনো খোঁজা শুরু করিনি, আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি বলায় মনে পড়ল।

আপনাকে খুঁজতে হবে না। মেয়ে পাওয়া গেছে।

তাই? আলহামদুলিল্লাহ। বাঁচা গেল। ঢাকা শহরে দেড় কোটি লোকের মাঝখান থেকে লুতফাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হতো।

আপনাকে সে যেদিন বলল, সেদিন দুপুরেই মেয়ে উপস্থিত। ব্যাপারটা যে পুরোপুরি কাকতালীয় তাতে কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে? আপনি নিশ্চয়ই দাবি করেন না যে আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে আপনি মেয়েকে নিয়ে এসেছেন।

পাগল হয়েছেন।

বুয়ার ধারণা আপনার দোয়াতেই কাজ হয়েছে। সে এখন নাকি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ধরেছে। সব পুরুষের সামনে পর্দা করছে। কাজ-টাজ কিছুই ঠিকমতো করছে না। খালি নাকি জায়নামাজে বসে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছে। মজার ব্যাপার হলো অভিও বুয়াকে সাপোর্ট দিচ্ছে। সেও বিশ্বাস করে আপনার দোয়াতে কাজ হয়েছে।

আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন তাই মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এখানে আমাদের কারও হাত নেই।

ইরাম কঠিন গলায় বলল, আপনার মতো মানুষদের জন্যেই সমাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। আপনারাই সমাজের ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট করেন। আপনারাই সাধারণ মানুষের ব্রেইন ওয়াশ করে টেররিস্ট বানিয়ে ফেলেন। অভির মাথা তো আপনি আগেই খারাপ করেছেন, এখন বুয়ার মাথাও খারাপ করলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। অভির মাথা যে আপনি কী পরিমাণ খারাপ করেছেন সেটা কি আপনি জানেন?

না, জানি না।

দু-এক দিনের ভেতর একবার এসে দেখে যান। ব্রাইট একটা ছেলে। বাবা-মায়ের কত আশা ছেলেটাকে নিয়ে; আপনি তাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছেন। ফালতু লোক। চৌদ্দো শ বছর আগের সব উদ্ভট উদ্ভট কথা। মহাপুরুষ মহাপুরুষ খেলা। ঈমানদার সেজে থাকা। রাত দুপুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি মানুষ বিশেষ কিছু হয়ে যায়?

ইরাম রাগে কাঁপছে। ছেলেটা এতটা রেগেছে কেন বুঝতে পারছি না। এত রাগার তো কিছু নেই। আমার যদি ভণ্ডামি থাকে, তাহলে এতে তার কী যায় আসে?

ইরাম বলল, আমি এখন যাব।

চা-টা কিছু খাবেন না?

না। আপনি দয়া করে অভিকে একটু দেখে যাবেন। ওর অবস্থা দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে হাজার বছর পিছিয়ে দেয়ার জন্যে আসলে আপনার শাস্তি হওয়া উচিত। কঠিন শাস্তি।

ইরাম গটগট করে বের হয়ে গেল। ছেলেটা সুদর্শন। দাড়ি না থাকায় ম্যানলি ভাবটা নেই। দাড়ি ছাড়া ছেলেদের রাগী চেহারা ভালো লাগে না। তবে ইরামের রাগটা অন্যরকম। কিছু রাগ আছে যাতে অবিশ্বাসের ভাইরাস থাকে, আর কিছু রাগ বিশ্বাসের প্রবেশপথের সঙ্গী হয়। ইরামের রাগটা কি বিশ্বাসের প্রবেশপথের সঙ্গী হয়ে এসেছে। ইরাম কি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছে? বিশ্বাসের এই বীজ আল্লাহ যার অন্তরে চান বুনে দেন। তারপর সেই বীজ এক সময় বড় বৃক্ষ হয়। বটবৃক্ষের মতো বড় বৃক্ষ হয়ে ডালপালা ছড়াতে থাকে।

ইরামের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি বেশ কয়েকবার। আল্লাহ যার জন্যে হেদায়াত রেখেছেন তাঁর হেদায়াত কেউ ঠেকাতে পারবে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ পথে আনতে পারবে না। ইরামের বেলায় আল্লাহর ইচ্ছা কী, সেটা তিনিই ভালো জানেন। তবে অভিদের বাড়িতে এখন ভুলেও যাওয়া যাবে না।

ইরাম মেসের ঠিকানা বের করে চলে এসেছে কীভাবে সেটাও এক রহস্য। ঠিকানা তার জানার কথা না। অভি আমাকে খুঁজতে মেসের ঠিকানা জোগাড় করে চলে আসতে পারে, এ ছাড়া ওই বাড়ির কারোরই আমাকে খুঁজে পাবার কথা না।

রাতে খেতে গিয়ে শুনি জহুরুল সাহেব আমার খাওয়া খেয়ে চলে গেছেন। মেসের

বাবুর্চি খুবই বিরক্তি প্রকাশ করল।

স্যার, জহুরুল মিয়া প্রত্যেকটা দিন এই কাম করে। আপনের খাওয়া খায়।

ঠিকই করেন। আমার সাথে তার এই ব্যাপারে কথা হয়েই আছে। এখন থেকে আমার খাবার হয়তো তিনিই খাবেন।

আপনি খাবেন না?

না। আমি কিছুদিন বাইরে থাকব।

আমাদের নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কত রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমিয়েছেন আল্লাহই ভালো জানেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমানোর আলাদা আনন্দ আছে। সেই আনন্দ পাবার উপায় হচ্ছে, পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে ঘুমোতে যাওয়া। ডান কাত হয়ে ঘুমানো। পেট ভর্তি করে পানি খাওয়ার জন্যেই হোক আর অন্য কারণেই হোক তখন ঝিমুনি আসে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমের সময় স্বপ্নও হয় অন্যরকম। তবে আজ তা হবে না। রাতে না খেলেও দিনে খেয়েছি। ক্ষুধার্ত ঘুমের স্বরূপ বুঝতে হলে সারাদিন রোজা থাকার পর শুধু খেজুর দিয়ে রোজা খুলে তারপর শুধু পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে ঘুমোতে যেতে হয়। অন্যরকম এক ঝিমুনি আসে তখন।

বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। জহুরুল সাহেব মিহি গলা ডাকলেন, আব্দুল্লাহ ভাই... আব্দুল্লাহ ভাই। আমি উঠে দরজা খুললাম।

জহুরুল সাহেব লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে এক ঠোঙা মুড়ি, খানিকটা গুড়। আমি বললাম, ব্যাপার কী বলুন তো?

শুনলাম আপনি খেতে গিয়েছিলেন। এদিকে আমি ভেবেছি আপনি আসবেন না।

ও এই ব্যাপার।

খুব লজ্জায় পড়েছি আব্দুল্লাহ ভাই। আপনার জন্যে মুড়ি এনেছি।

ভালো করেছেন। আজ রাতটা আর কিছু খাব না ঠিক করেছি। আচ্ছা এনেছেন যখন দেখি এক মুঠো।

মাত্র এইটুকু? গুড় দিয়ে ভালো করে খান।

আজ খাব না ভাই। আপনি আনলেন তাই খেলাম। আপনি গুড়-মুড়ি খান। আমি মুড়ি খাওয়ার শব্দ শুনি।

আর খাবেন না আব্দুল্লাহ ভাই?

না। তারপর ওই দিন কী হলো বলুন—পুলিশেরা যত্ন করে খাইয়েছিল?

যত্ন বলে যত্ন। এক হোটেলে নিয়ে গেছে। পোলাও, গরুর রেজালা, ডিমের কোরমা, হাঁসের গোশত, সব শেষে দই-ফিরনি। এলাহি ব্যাপার। খুবই যত্ন করেছে ভাই আলহামদুলিল্লাহ। হাঁসের গোশতটা তো অসাধারণ ছিল। এত ভালো হাঁসের গোশত আমি আমার জীবনে খাইনি। বেশি করে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়েছে। আর রসুন কুচি কুচি করে কেটে দিয়ে ভুনা ভুনা করেছে। গরমের সময়ের হাঁসের গোশতে তেমন স্বাদ হয় না। হাঁসের গোশত খাওয়ার উত্তম সময় হলো শীতকাল। তখন নতুন ধান ওঠে। ধান খেয়ে খেয়ে হাঁসের গায়ে চর্বি হয়। আপনার ভাবিও খুব ভালো হাঁস রাঁধতে পারে আলহামদুলিল্লাহ। তার হাঁস রান্নার কৌশল আলাদা। নতুন আলু দিয়ে রাঁধে। আপনাকে একবার নিয়ে যাব ইনশা-আল্লাহ। আপনার ভাবির হাতের রান্নার হাঁস খেয়ে আসবেন।

কবে নিয়ে যাবেন?

এই শীতেই নিয়ে যাব। আপনার ভাবিকে চিঠিতে আপনার কথা প্রায়ই লিখি তো। তারও খুব শখ আপনাকে মেহমানদারি করার। একবার আপনার অসুখ হলো। আপনার ভাবিকে বলেছিলাম দোয়া করতে। সে খুব চিন্তিত হয়েছিল। কুরআন খতম দিয়ে বসে আছে। মেয়েমানুষ তো, অল্পতে অস্থির হয়।

আপনার চাকরির কী হলো? শনিবারে হবার কথা ছিল না? গিয়েছিলেন?

জহুরুল সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম,

কি, চাকরির খোঁজ নিতে যাননি?

জি, গিয়েছিলাম। ইয়াকুব আমার ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল।

ভুলে গিয়েছিল মানে?

হ্যাঁ। সে তো একটা কাজ নিয়ে থাকে না। সব সময় খুব ব্যস্ত থাকে। এক হাতে

অসংখ্য কাজ করতে হয় তাকে। তার দোষ নেই। তার পিএ আমার ফাইলটা তার হাতে দেয়নি। কাজেই ভুলে গেছে।

এখন কি ফাইল দিয়েছে?

এখন তো দেবেই। পিএ-কে ডেকে খুব ধমকা-ধমকি করল। আমার সামনেই করল। বেচারার জন্যেও মায়া লাগছিল। সে তো আর শত্রুতা করে আমার ফাইল আটকে রাখেনি। ভুলে গেছে। মানুষ মাত্রই তো ভুল হয়।

আচ্ছা। তাহলে ইয়াকুব সাহেব এখন চাকরির ব্যাপারে কী বলছেন? কবে নাগাদ হবে?

তারিখ-টারিখ বলেনি। আরেকটা বায়োডাটা জমা দিতে বলেছে।

দিয়েছেন?

হু।

এবারও কি ফাইলের ওপর আর্জেন্ট লিখে দিয়েছেন?

হু।

আবার কবে খোঁজ নিতে বলেছেন?

বলেছে বার বার এসে খোঁজ নেয়ার দরকার নেই। চাকরির ব্যবস্থা হলেই চিঠি চলে আসবে।

সেই চিঠি কবে নাগাদ আসবে তার কোনো নির্দিষ্ট সময় কি বলেছে?

খুব তাড়াতাড়ি আসবে আশা করি। আমি আমার অবস্থার কথাটা তাকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেছি। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম যে, অন্যের খাবার খেয়ে বেঁচে আছি। কথাটা শুনে সেও খুবই মন খারাপ করল।

বুঝলেন কী করে যে মন খারাপ করেছে? মুখে কিছু বলেছে?

কিছু বলেনি। চেহারা দেখে বুঝেছি।

আমার কী মনে হয় জানেন জহুরুল সাহেব, আপনার অন্যান্য জায়গাতেও

চাকরির চেষ্টা করা উচিত। ইয়াকুব সাহেবের ভাব-গতি ভালো মনে হচ্ছে না। এখানে চাকরির আশায় বসে থাকাটা কেমন যেন ভালো ঠেকছে না।

কী বলেন আব্দুল্লাহ ভাই। ইয়াকুব আমার স্কুলজীবনের বন্ধু। আমার সমস্যা সবটাই সে জানে। আমার ধারণা এক সপ্তাহের মধ্যেই চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পাব।

যদি না পান?

না পেলে অফিসে গিয়ে আবারও তার সাথে দেখা করব। বার বার যেতে অবশ্য লজ্জাও লাগে। নানান কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কাজে ডিস্টার্ব হয়।

ঘর অন্ধকার। মচ মচ শব্দ হচ্ছে। জহুরুল সাহেব মুড়ি খাচ্ছেন।

আব্দুল্লাহ ভাই।

জি।

ফ্রেশ মুড়ি। আরেকটু খেয়ে দেখবেন?

আপনি খান।

মুড়ির আসল স্বাদও পাওয়া যায় শীতকালে। আপনার ভাবি মুড়ি দিয়ে মোয়া বানাতে পারে। কী জিনিস তা না খেলে বুঝবেন না।

একবার খেয়ে আসব ইনশা-আল্লাহ।

অবশ্যই খেয়ে আসবেন আল্লাহ চাইলে।

জহুরুল সাহেব।

জি।

আমি কিছুদিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকব। কেউ আমার খোঁজে এলে বলার দরকার নেই আমি কই আছি। কী গোপন রাখতে পারবেন তো?

আপনি বললে অবশ্যই পারব ইনশা-আল্লাহ। আপনার জন্যে করব না এমন কাজ নেই আব্দুল্লাহ ভাই। শুধু আল্লাহর নাফরমানি করতে পারব না।

আল্লাহর নাফরমানি করতে হবে না ভাই, আল্লাহ মাফ করুক। শুধু তথ্য গোপন রাখতে হবে। ইরাম নামের একটা ছেলে এসে যদি আমার খোঁজ করে, তবে তাকে বলবেন যে, আমার সাথে দেখা করতে হলে পরে আসতে হবে। কোথায় আছি সেটা বলা নিষেধ। তবে আইশার বাবা এলে কোথায় আছি সেই ঠিকানা দিয়ে দেবেন।

ঠিকানা কী?

আমার এক খালা আছে। রাহেলা খালা। গুলশানে থাকে। গুলশান দুই নম্বর। বাড়ির নাম গগন আলী মিয়া প্যালেস। ওই প্যালেসে সপ্তাহ খানেক গিয়ে থাকব ইনশা-আল্লাহ। না থাক, আইশার বাবাকেও ঠিকানা দেয়ার দরকার নেই।

জহুরুল সাহেব গুড় কামড় দিয়ে মুড়ি চাবাচ্ছেন। মচ মচ শব্দ চার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনতে ভালোই লাগছে। আল্লাহ কার রিজিক কোথায় রেখেছেন সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। হয়তো আমার মেসের খাবারে জহুরুল সাহেবের নাম লেখা আছে। সেই খাবার চাইলেও আমি খেতে পারব না। জহুরুল সাহেবের জন্যে যা বরাদ্দ আছে সেটা তো আল্লাহ তাকে দেবেনই।

গুলশান এলাকায় সবচেয়ে কুৎসিত এবং প্রকাণ্ড যে বাড়িটা সেটাই রাহেলা খালার। ভুল বললাম। বলা উচিত গগন আলী মিয়ার অর্থাৎ আমার খালু সাহেবের। খালু সাহেব গগন আলী মিয়া মানুষটা ছিলেন অন্যরকম। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করত মারাত্মক। মানুষের সিক্সথ সেন্স প্রখর থাকতেই পারে। কেউ কেউ কিছু ব্যাপার আগে আগে অনুভব করতে পারে। তবে হ্যাঁ, তা সর্বদা শতভাগ নির্ভুল এবং পুরোপুরি যথাযথ হওয়া জরুরি নয়। ভাগ্য বলে দেয়া বা ভাগ্য গণনা করা হারাম, কিন্তু আগে আগে কিছু বুঝতে পারার ব্যাপারটা সত্য; এটা একটা অনুভূতি। এমনকি মৌমাছির মতো একজন আরেকজনের সাথে কোনো মাধ্যম ছাড়াই যোগাযোগ করার ঘটনা বিরল হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইংরেজিতে একে বলে টেলিপ্যাথি। এগুলো সবই আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা। আল্লাহ কিছু মানুষকে বিশেষ কিছু সময়ে এই ক্ষমতা দিয়ে দেন। পরিভাষায় এগুলোকে বলে 'কারামত'।

আমাদের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা)-এরও এমন কিছু ক্ষমতা ছিল। তখন খালিফা উমর বিন খাত্তাব (রা) এর শাসনামলের ঘটনা।

একদিন খুতবা দেয়ার সময় হঠাৎ উমর (রা) বলে উঠলেন,

ইয়া সারিয়া! আল-জাবাল।

ইয়া সারিয়া! আল-জাবাল।

মদিনায় মাসজিদে নববীতে জুমার খুতবার অবস্থায় খলিফা উমর (রা) হঠাৎ করে এই অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন বাক্য উচ্চারণ করায় সবাই বেশ অবাক এবং বিস্মিত হলো। এরপর আবার খলিফা যথারীতি তাঁর খুতবা পাঠ করতে থাকেন।

ইয়া সারিয়া! আল-জাবাল—খুতবার এ অপ্রাসঙ্গিক অংশটি সবার মধ্যে

কৌতূহলের সৃষ্টি করল।

অন্যদিকে একই সময় ইরাকের দূরবর্তী স্থান নেহাবন্দে যেখানে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সারিয়া হঠাৎ এক অদৃশ্য কণ্ঠে রহস্যময় এই বাক্যটি নিজ কানে শুনতে পান। দুটি বাক্য কোথা থেকে কে উচ্চারণ করেছেন, এ কথা ভেবে তিনি রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়েন।

খুতবার মাঝে হঠাৎ খলিফার অদ্ভুত বাক্য উচ্চারণ কেন, কারও সাহস হচ্ছে না খলিফাকে জিজ্ঞেস করার।

খুতবা ও নামায শেষে মাসজিদে উপস্থিত অনেকের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়।

হযরত ওমর (রা) এর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এর।

খোলামেলা আলোচনা করতেন তিনি খলিফার সাথে। তিনি অসংকোচে খলিফাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ আপনি খুতবার মধ্যে অসংলগ্নভাবে ইয়া সারিয়া! আল-জাবাল (দুই কিংবা তিন বার) উচ্চারণ করলেন কেন?

উত্তরে উমর (রা) একটি সৈন্য বাহিনীর কথা উল্লেখ করলেন—যারা নেহাবন্দে জিহাদে লিপ্ত। এ বাহিনীর সেনাপতি সারিয়া। তিনি বলেন, আমি দেখেছি সারিয়া একটি পর্বতের পাশে লড়ছেন। অথচ তিনি জানেন না যে, সামনে এবং পেছন থেকে এগিয়ে এসে শত্রু বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলার উপক্রম করেছে। এ শোচনীয় অবস্থা দেখে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। আমি স্থির থাকতে না পেরে আওয়াজ দিতে থাকি—হে সারিয়া, পর্বতের সাথে মিলে যাও।

ইয়া সারিয়া! আল-জাবাল। (হে সারিয়া, পর্বতের সাথে মিলে যাও।)

নেহাবন্দের রণক্ষেত্র থেকে বেশ কিছুদিন পর কাসেদ মদীনায় আগমন করেন এবং যুদ্ধের বিবরণ দিতে থাকেন এবং পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করেন। কাসেদ জানান, আমরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত তখন হঠাৎ একটি অদৃশ্য কণ্ঠ শোনা গেল, ইয়া সারিয়া! আল-জাবাল। আওয়াজটি শোনামাত্র আমরা পর্বতের সাথে মিলে যাই এবং আমাদের বিজয় সূচিত হয়।

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ) তাঁর বিখ্যাত তারিখুল খুলাফা গ্রন্থে ঘটনাটি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমর (রা) এর মতো এমন না তবে আমার খালু সাহেবের সিক্সথ সেন্সও ছিল অকল্পনীয়। তিনি সস্তা গন্ডার সময়ে, যখন গুলশানে বনবাদাড় ছাড়া কিছু নেই, ভুলক্রমেও কেউ ওই পথ মাড়ায় না। ঠিক সেই সময়ে গুলশানে দুই বিঘা জমি কিনে ফেলে রেখেছিলেন। তিনি কী পরিমাণ বোকা সেটা বোঝাতে সেই সময় এই ঘটনার উদাহরণ উল্লেখ করা হতো। সেই সময় বাসায় কেউ এলেই তার কাছে অভিযোগের সুরে রাহেলা খালা বলতেন, বেকুবটার কাণ্ড দেখেছ, দুই বিঘা জঙ্গল কিনে বসে আছে!

খালু সাহেবের চেহারা অবশ্য বোকাদের মতোই ছিল। তিনি যখন কারও কথা শুনতেন তখন তার অজান্তেই মুখ হাঁ হয়ে যেত। ব্যবসা নিয়ে তিনি যা পরিকল্পনা করতেন সেগুলো খুব হাস্যকর মনে হতো। যে বছর দেশে আলুর প্রচুর ফলন হলো এবং আলুর দাম পড়ে গেল। সে বছরই তিনি আলুর ব্যবসা শুরু করলেন। ইন্ডিয়া থেকে আলু আনার জন্যে এলসি খুললেন। অন্য ব্যবসায়ীরা হাসল। হাসারই কথা। রাহেলা খালা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি নাকি বেকুবের মতো আলুর ব্যবসায় নেমেছ? দিনকে দিন তুমি বেকুব হয়ে যাচ্ছ, এটা দেখতে খারাপ লাগছে। আগে তো কথা শোনার সময় মাঝেমধ্যে তোমার মুখটা হাঁ হয়ে থাকত। এখন তো দেখছি পুরো সময় ধরেই হাঁ করে থাকো। লজ্জা লাগে না তোমার। আলু ভারত থেকে আনানোর এই অভিনব ব্যবসার বুদ্ধি তোমাকে কে দিলো?

খালু সাহেব হাঁ হয়ে থাকা মুখ একটু বুজে বলেন,

কেউ দেয় নাই। আমার নিজেরই বুদ্ধি। এই বছর আলুর ফলন খুব বেশি হয়েছে তো, চাষিরা একদম দাম পায় নাই। এ জন্যে আগামী বছর চাষিরা আলুর চাষ করবে কম। সুতরাং আলুর দাম হবে আকাশছোঁয়া।

তোমারে বলছে। তোমার মাথা।

দেখোই না কী হয়। একটু ধৈর্য ধরো।

গগন আলী সাহেব যা বললেন শেষমেশ তা-ই হলো। পরের বছর আলু দেশে প্রায় হলোই না।

রাহেলা খালার মুখ গগন আলী সাহেবের মতো হাঁ হয়ে গেল। তিনি পুরোই হতভম্ব। রাহেলা খালা সে সময় বলে বেড়াতে লাগলেন, আমার জামাইটা বোকা মানুষ। সে বোকা দেখেই তার ওপর আল্লাহর রহমত আছে। না হলে কি যে ব্যবসাই হাত দেয় তা-ই ফুলেফেঁপে বড় হয়ে যায়। গগন আলী যে ব্যবসাই করে—দুহাতে টাকা আনে। টাকা ব্যাংকে রাখার জায়গা নেই, এমন অবস্থা।

তবে গগন আলী সাহেবের টাকা বাড়লেও রাহেলা খালার আফসোসের কোনো সীমা নেই।

বেকুব স্বামী টাকা রোজগার করাই শিখেছে, খরচ করা শিখেনি। তিনি আফসোসের সঙ্গে বলেন, টাকা খরচ করতে তো বুদ্ধি লাগে। এই লোকের বুদ্ধি নাই, সে খালি টাকা কামাবে। আর জমাবে। খরচ কীভাবে করতে হয় সে জানেই না।

গগন আলী সাহেব এর একটা দুর্বলতা আছে। তিনি মাছ এবং গোশত একসাথে খেতে পারেন না। ছোটবেলায় তার মা তাকে বলতেন, মাছ-গোশত একসাথে খেলে পেটের সমস্যা হয়? সেটাই বুড়ো বয়সেও তার মাথায় রয়ে গেছে। তিনি যে শুধু মাছ-গোশত এক সাথে খেতে পারেন না ব্যাপারটা শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি এমনিতে গাড়িতেও চড়তে পারেন না; বেবি টেক্সি, সিএনজিতেও না। পেট্রোলে বা গ্যাসের গন্ধ তার একদম সহ্য হয় না। বমি হয়ে যায়। লোকজনের গাড়ি থা গগন আলী সাহেব গাড়ি কেনেননি তিনি কিনেছেন রিকশা। সেই রিকশার চারি সাদা রং করিয়েছেন আর সামনে-পেছনে ইংরেজিতে লিখিয়েছেন 'PRIVATE শুধু প্রাইভেট রিকশা না, তার একটা প্রাইভেট টমটমও আছে। ইলেক্ট্রিসিটিতে চলে। এই জিনিসও তিনি প্রাইভেট লিখে ব্যবহার করেন। সাধারণত টমটমের রং হয় সবুজ তিনি করিয়েছেন সাদা। খালু সাহেবের রিকশা এবং টমটম দুটোই তিনি ধবধবে সাদা রং করিয়েছেন। সাদা রং এর প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তিনি সাধারণত রিকশাতেই চলাফেরা করতেন। তবে যেসব জায়গায় রিকশা যায় না সেসব জায়গায় তিনি টমটম ব্যবহার করে যান।

সেই রিকশা বা টমটমে কোথাও যেতে হলে রাহেলা খালা ভীষণ লজ্জায় পরতেন। তার মাথা কাটা যেত। বিশেষ করে রিকশার ব্যাপারে খালার লজ্জা বহুগুণ বেড়ে যায়। সাধারণ রিকশায় চড়া যায়, কিন্তু প্রাইভেট লেখা রিকশায় কি চড়া যায়? লোকজন কেমন চোখে যেন তাকায়। হাসির খোরাক হতে হয়।

শেষ পর্যন্ত রাহেলা খালা খালু সাহেবের সাথে জেদ করে একটা গাড়ি কিনেছিলেন। খালু সাহেব নাকে পারফিউম ভেজানো রুমালচাপা দিয়ে কয়েকবার সেই গাড়িতে চড়ারও চেষ্টা করলেন এবং যারপরনাই ব্যর্থ হলেন এবং আবার ফিরে গেলেন প্রাইভেট রিকশা আর টমটমে। তাতে করে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো অসুবিধা হলো না। ব্যবসা-বাণিজ্য হুরহুর করে বাড়তে লাগল। একসময় গার্মেন্টসের ব্যবসাটাকে নতুন করে বুঝলেন। তারপর কাপড়ের কল দিলেন, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি করলেন।

গগন আলী মিয়ার সম্পদ যত বাড়ে রাহেলা খালার আফসোসও তত বাড়ে। তিনি তখন বলতেন,

আমাদের খালি টাকা আর টাকা। কী হবে এত টাকা দিয়ে? কত শখ ছিল দেশের বাইরে ঘুরতে যাব। একবারও দেশের বাইরে যেতে পারলাম না, এমন এক বোকা লোকের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে, যে কিনা আকাশে প্লেন দেখলে মাটিতে বসে তার বুক আনচান করতে থাকে। এই রকম ভিতু আর বোকা মানুষটাকে নিয়ে এই জীবনে কোনোদিন কি দেশের বাইরে ঘুরতে যেতে পারব? কোনো দিন পারব না। আশেপাশের মানুষজন ঈদের শপিং করতে সিঙ্গাপুর যায়, ব্যাংকক যায়। আর আমি কোটিপতির বউ; টাকার অভাব আমার জামাইয়ের নাই। এই আমিই কিনা ঈদের শপিং করতে যাই গাউছিয়া, নিউমার্কেট, বসুন্ধরা, যমুনায়।

খালু সাহেবের মৃত্যুর পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন যে কী পরিমাণ হয়েছে সেটা তার বাড়িতে ঢুকেই বোঝা যায়।

পুরোনো বাড়ি ভেঙে কী হুলুস্থুল করা হয়েছে। সিঁড়ি করা হয়েছে মার্বেল পাথর দিয়ে। ময়লা জুতো পায়ে দিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ভয় লাগে। প্রত্যেক ঘরে বিশাল বিশাল ঝাড়বাতি। ড্রয়িংরুমে ঢুকে, ঘরের আলিশান অবস্থা দেখে আমি হতভম্ব গলায় বললাম, কী করেছ এগুলো রাহেলা খালা, সর্বনাশ!

রাহেলা খালা আমার হকচকিয়ে যাওয়াটাকে বেশ উপভোগ করছেন। তিনি আনন্দিত গলায় বলল, বাড়ি রিনোভেশনের পর তুই আর আসিসনি তাই না।

না। তুমি তো ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছ খালা।

ভালো আর্কিটেক্ট দিয়ে করিয়েছি। টাকাও অনেক নিয়েছে। ব্যাটা কাজ জানে,

টাকা তো নেবেই। ভেতরের এই যে অভিনব সব কাজ দেখছিস এগুলো করেছে ইন্টারনাল ডিজাইনার। আমেরিকা থেকে পাশ করা ডিজাইনার। যত ফার্নিচার-টার্নিচার যা কিছু দেখছিস সব ওই ব্যাটাকে দিয়েই ডিজাইন করিয়েছি। দেয়ালে যে পেইন্টিংগুলো দেখছিস সেগুলোও কোনটা কোথায় বসবে সে-ই ঠিক করে দিয়েছে।

এই রকম রাজপ্রাসাদে কখনো আমি থাকিনি খালা। এখনো থাকতে পারব বলে তো মনে হচ্ছে না। দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। এখনই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

রাহেলা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, তোর ঘর দেখিয়ে দিই। ঘর দেখলে তুই আর যেতে চাইবি না। অতিথিদের জন্যে ঘর করা হয়েছে দুটা। এই দুটার যেকোনো একটায় তুই থাকবি। তোর যেটা পছন্দ হবে তোকে সেই ঘরটাই থাকতে দেয়া হবে। একটায় ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচার, অন্যটায় মডার্ন। তোর কোন ধরনের ফার্নিচার পছন্দ? তোর যদি রাজা-মহারাজা ইতিহাসের ওপর ফেসিনেশন থাকে, তাহলে ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচারসমেত যে ঘরটা আছে সেটায় থাকতে পারিস। তুই দুটো ঘরই দেখ। যেটা ভালো লাগে। দুটোতেই এটাচ্ড বাথ। দুটোতেই এসি।

এই বিশাল অট্টালিকায় তুমি একা একা থাকো?

একা তো থাকতেই হবে, উপায় কী? গোষ্ঠীর আত্মীয়-স্বজন এনে ঢোকাব? পে খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে মেরে রেখে যাবে। সবাই আছে টাকার ধান্দ আত্মীয়-স্বজন দেখলেই ইদানীং আমার ভয় লাগে।

আমাকে নিশ্চয়ই ভয় লাগছে তোমার?

না, তোকে ভয় লাগছে না। তোকে ভয় লাগবে কেন? শোন, কোন বেলা কী খেতে চাস বাবুর্চিকে বলবি। কোনো সংকোচ করবি না। বাবুর্চি রেঁধে দেবে। আমার এখানে দুজন বাবুর্চি আছে। ইংলিশ ফুডের জন্যে এক জন, বাঙালি ফুডের জন্যে এক জন।

চাইনিজ ফুড কে রাঁধে?

ইংলিশ বাবুর্চিই রাঁধে। ও চাইনিজ ফুডের কোর্সও করেছে।

ইংলিশ বাবুর্চিকে দিয়ে চাইনিজ রান্না করানোর থেকে একজন চাইনিজ বাবুর্চিকে চায়না থেকে ধরে আনলেই তো পারো।

আমার এত চাইনিজ ফুডের প্রতি ফ্যাসিনেশন নেই। তোর নিশ্চয়ই চাইনিজ খুব পছন্দ? রাতে কী খেতে ইচ্ছে করছে তোর, চাইনিজ?

তুমি যা খাও তা-ই খাব।

তোর যখন চাইনিজ ইচ্ছা হয়েছে তখন চাইনিজই খাব। দাঁড়া বাবুর্চিকে বলে দিই। এই বাড়ির আরেকটা মজা কী জানিস? কথা বলার জন্যে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে কষ্ট করে যেতে হবে না। ঘরে ঘরে ইন্টারকম আছে। বোতাম টিপলেই হলো। আয়, তোকে ইন্টারকম ব্যবহার শিখিয়ে দিই।

ইন্টারকম ব্যবহার করা শিখলাম। বাথরুমের গরম পানি, ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা শিখলাম। এসি চালানো শিখলাম। রিমোট কন্ট্রোল স্প্লিট এসি। বিছানায় শুয়ে শুয়েও বোতাম টিপে এসি অন করা যায়। ঘর আপনাআপনি ঠান্ডা গরম হয়।

আব্দুল্লাহ, আগে না তুই বেশ গান শুনতি? এখন কি তোর তোর গান-বাজনার শখ আছে? আমার এখানে কিন্তু একটা মিউজিক রুমও আছে। সিডি ডিভিডি এমনকি গ্রামোফোনসহ হোম থিয়েটারের সব ব্যবস্থা আছে।

গান-বাজনার কথা বাদ দাও, মিউজিক যেহেতু হারাম তাই এগুলো এখন আর শুনি না। আচ্ছা গান-বাজনার ঘরটা ছাড়া আর কী আছে?

প্রেয়ার রুম আছে।

সেটা আবার কী?

প্রার্থনার ঘর। নামায পড়তে ইচ্ছে হলে নামায পড়বি। দেখবি? দেখতে হলে ওজু করে ফেল। ওজু ছাড়া নামায-ঘরে ঢোকা নিষেধ।

মা শা আল্লাহ। ভালো তো। নামায-ঘরও করেছ দেখছি। নামায-ঘরে কী আছে? জায়নামাজ, টুপি?

আরে না। জায়নামাজের দরকার নেই। ফ্লোর সবুজ মার্বেলের। রোজ একবার সাধারণ পানি দিয়ে মোছা হয়, তারপর খুব হালকা করে উদ এর আতর মেশানো পানি দিয়ে মোছা হয়।

চারদিকে কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি। ইসলামিক আর্ট

ডিজাইন। এই ডিজাইন আবার দুবাইয়ের এক মুসলিম ডিজাইনারকে দিয়ে করিয়েছি।

বাহ! দারুণ করে নামাযের ঘরটা সাজিয়েছ, মা শা আল্লাহ। তাহলে তো নিশ্চয়ই নামায পড়াও শুরু করে দিয়েছ, তাই না?

না, এখনো নামায-রোজা শুরু করিনি। তবে শুরু করব দেখি। ছোটবেলায় কোরান শরীফ পড়া শিখেছিলাম, তারপর ভুলে গেছি। কথায় বলে না, অনভ্যাসে বিদ্যা নাশ। তা-ই হয়েছে। একজন মাওলানা রেখে কুরআন শরীফ পড়া শিখে তারপর নামায ধরব।

এখনই ধরে ফেলো। একবারে শিখে ধরতে হবে না, এরই মধ্যে যদি তোমার সময় শেষ হয়ে আসে খালু সাহেবের মতো বলা তো যায় না।

রাহেলা খালা সরু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। আমার কথাটা ভালো লাগেনি মনে হয়।

আয় নামায-ঘর দেখবি। ওজু করে আয়।

বাংলাদেশে এই জিনিস আর কারও ঘরে নেই। এখন আবার অনেকেই আমার ডিজাইন নকল করছে। প্রেয়ার রুম বানাচ্ছে। নকলবাজের দেশ। ভালো কিছু করলেই নকল করে ফেলে।

তোমার বাড়িতে তো সবই আছে দেখছি। তার মানে এমন বাড়ি বানিয়েছ যেখানে মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। তাহলে তো এই বাড়িতে নিশ্চয়ই বারও আছে?

আছে। থাকবে না কেন? বার ছাড়া কোনো মডার্ন বাড়ির ডিজাইন হয়? ছাদের চিলেকোঠায় বার করেছি। তোর তো আর ওইসবের বদ অভ্যেস থাকার কথা না। থাকলেও ভুলে যা। আমার বাড়িতে বেলেল্লাপনা চলবে না। যা ওজু করে আয়, তোকে নামায-ঘরটা দেখিয়ে আনি।

ওজু করে নামায-ঘর দেখতে গেলাম। খালা মুগ্ধ গলায় বললেন, ঘরে কোনো বাল্ব বা টিউব লাইট দেখছিস?

না খালা।

তারপরেও ঘর আলো হয়ে আছে না?

হ্যাঁ।

এর নাম কনসিল্ড লাইটিং। বাঁ-দিকের দেয়ালে দেখ একটা সুইচ; টিপে দে।

টিপলে কী হবে?

টিপে দেখ না। বিসমিল্লাহ বলে টিপবি।

আমি বিসমিল্লাহ বলে সুইচ টিপে আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছি। আমার ধারণা, সুইচ টেপার সাথে সাথে পুরো নামায-ঘর আস্তে আস্তে পশ্চিম দিকে ঘুরে যাবে। তা হলো না। যা হলো সেটাও কম বিস্ময়কর না। কোরআন তেলাওয়াত হতে লাগল। মিশারি রাশিদ আল আফাসি সাহেবের সুমধুর তেলাওয়াত।

রাহেলা খালা বললেন, পুরো কোরান শরীফ রেকর্ড করা আছে। একবার বোতাম টিপে দিলে অটোমেটিক কোরান খতম হয়ে যায়।

সেই কুরআন খতমের সওয়াব তো তুমি পাও না, সওয়াব পায় তোমার ওই ডিভিডি প্লেয়ার। তোমার কথা বলা মুশকিল। কিন্তু এই ডিভিডি প্লেয়ারটার বেহেশতে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে খালা।

খবরদার, নামায-ঘরে কোনো ঠাট্টা ফাজলামি করবি না।

নামায-ঘরে কুরআন পাঠ চলছে। আরও কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে ইচ্ছে করছিল। কী মধুর তেলাওয়াত! এ বাড়িতে সময় কাটানোর এই একটা দিক ভালো লাগছে। সূরা বাকারা মুখস্থ করতে এ ঘরটায় সময় কাটানো যাবে। কুরআন পাঠ চলতে লাগল। খালা আমাকে ছাদের চিলেকোঠায় বার দেখাতে নিয়ে গেলেন। শ্বেতপাথরের কাউন্টার টেবিল। পেছনে আলমারি ভর্তি নানা আকারের এবং নানা রঙের বোতল ঝিকমিক করছে।

কালেকশান কেমন, দেখেছিস?

হু। আক্কেলগুড়ুম অবস্থা। শুধু আক্কেলগুড়ুম না, একই সাথে বেআক্কেলগুড়ুম।

বেআক্কেলগুড়ুম আবার কী?

ও তুমি এখন বুঝবে না। করেছ কী তুমি? দুনিয়ার সব বোতল দেখি জোগাড় করে

ফেলেছ!

খাওয়ার লোক নেই তো। শুধু জমছে।

তোমার এই বারে সব থেকে দামি বোতল কোনটা খালা?

পেটমোটা বোতলটা। ওই যে দেখে যেটাকে মাটির বোতল মনে হচ্ছে ওইটা। ওটা কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পুরোনো রেড ওয়াইন। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের বিশেষ বিশেষ উৎসবে এটা খাওয়া হয়।

এই জিনিসের দাম কত, সেটা জানতে ইচ্ছে করছে।

দাম জেনে কী করবি। দাম জানলে মাথা ঘুরে পরে যাবি। ভিরমি খাবি। শেষে আবার তোর জন্যে ডাক্তার ডাকতে হবে।

আমি তো খালা দাম শোনার আগে এমনিতেই ভিরমি খেয়েই আছি। আজ আর আমার ভাত-চাইনিজ কিছুই পেট দিয়ে ঢুকবে না। ভিরমি খেয়ে পেট ভরে গেছে।

আনন্দে খালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। আমার মুখ হয়ে গেল অন্ধকার। এক সপ্তাহ এ বাড়িতে থাকা অসম্ভব। চেষ্টা করব আজই পালাতে। রাতটা কোনোমতে পার ক সকালে সূর্য ওঠার আগেই দৌড় দিতে হবে।

আয় এখন তোকে এই বাসার লাইব্রেরি ঘরটা দেখাই।

কি বলো? এখানে লাইব্রেরি ঘরও আছে?

বলিস কি! লাইব্রেরি ঘর থাকবে না? তোর কি ধারণা আমি একটা অসম্পূর্ণ ডিজাইন করেছি? কখনো না। আয় লাইব্রেরি ঘরটা দেখবি। ঘরটা পুরোটাই কাঠ দিয়ে করেছি। এমনকি মেঝেও কাঠের। সব রকম বই-পত্র আছে; দেশি এবং বিদেশি, ইসলামিক বইয়ের দারুণ সব কালেকশন আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুই বই পড়ে কাটিয়ে দিতে পারবি। আর দেশি সাধারণ বইয়ের জন্যে নিউ মার্কেটের এক দোকানের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে রেখেছি। ভালো ভালো বই এলেই পাঠিয়ে দেয়। লাইব্রেরি ঘরে কম্পিউটার বসিয়েছি। তুই কম্পিউটার চালাতে জানিস।

থোরা বহত।

মানে কী?

মানে অল্পস্বল্প জানি।

আমি তো একদমই জানি না। যাদের কাছ থেকে কিনেছি ওদের বলা আছে। অবসর পেলেই খবর দেবো, ওরা এসে শিখিয়ে দেবে।

অবসর পাচ্ছ না?

অবসর পাব কী করে বল তো? সকালটায় একটু অবসর থাকে। দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমুতে যাই, সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাই। সারা রাত জেগে থাকি, দুপুরে না ঘুমোলে কি চলে?

সারা রাত জেগে থাকো কেন?

ঘুম না হলে জেগে না থেকে করব কী?

ঘুম হয় না?

না।

ডাক্তার দেখিয়েছ?

হেন ডাক্তার নেই যে দেখাইনি। ডাক্তার, পীর-ফকিরের পেছনে জলের মতো টাকা খরচ করেছি। এখনো করছি। লাভ তেমন কিছু হচ্ছে না।

এখন কি কোনো চিকিৎসা নিচ্ছ না।

নেব না কেন! এখনো চিকিৎসা চলছে। সাইকিয়াট্রিস্ট চিকিৎসা করছেন।

সাইকিয়াট্রিস্ট তোমার সমস্যা ধরতে পারছে না?

সমস্যা ধরতে পেরেছে বলে তো মনে হয় না। ওদের চিকিৎসায় লাভ হচ্ছে না। এখন তুই হলি ভরসা।

আমি ভরসা মানে? ভরসা তো করবে আল্লাহর ওপর। আর আমি তো ডাক্তারও না।

ডাক্তার না হলেও তোর নাকি অনেক ক্ষমতা। সবাই বলে। তুই যা দোয়া করিস তা-ই নাকি কবুল হয়। তুই আমাকে রাতে ঘুমের ব্যবস্থা করে দে। তুই যা চাইবি তা-ই পাবি। তোর খালুর পুরোনো গাড়িটা তোকে নাহয় উপহার হিসেবে দিয়ে দেবো।

খালুর সেই পুরোনো গাড়িটা পাব এই আনন্দ আমাকে তেমন একটা অভিভূত করতে পারল না। আমার ভয় হলো এই ভেবে যে, রাহেলা খালা আমার ওপর ভর করছেন। সিন্দাবাদের ভূত সিন্দাবাদের ওপর একা চেপেছিল। রাহেলা খালা আমার ওপর একা চাপেননি, তার পুরো বাড়ি নিয়ে চেপেছেন। একদিনেই আমার চ্যাপ্টা হয়ে যাবার কথা এবং আমি চ্যাপ্টা হওয়াও শুরু করেছি।

আব্দুল্লাহ।

জি।

আমার ব্যাপারটা কখন শুনবি?

তোমার কোন ব্যাপার?

ও মা এতক্ষণ কী বললাম, রাতে ঘুম না হওয়ার ব্যাপারটা।

একসময় শুনলেই হবে।

এখনই শোন।

না খালা এখন শুনতে ইচ্ছে করছে না।

এখন তাহলে তুই কী করবি?

বুঝতে পারছি না। নিজের আলিশান ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব বলে ভাবছি। যে বিছানা বানিয়েছ, শুতেও সাহস হচ্ছে না।

রাহেলা খালা বললেন, বিছানা এমন কিছু না। সাধারণ ফোমের তোশক। তবে বালিশটার বিশেষত্ব আছে।

কী বিশেষত্ব?

এই বালিশগুলো হচ্ছে পাখির পালকের।

বলো কী?

খুবই দামি বালিশ। জ্যান্ত পাখির পাখা থেকে এসব বালিশ তৈরি হয়। মরা পাখির পালকে বালিশ হয় না।

জ্যান্ত পাখির শরীর থেকে নিয়ে এই বালিশ তৈরি হয় বলো কী!!

হুম।

একটা পালকের বালিশের জন্যে ক'টা পাখির পালক লাগে?

কী করে বলব ক'টা, বিশ-পঁচিশটা নিশ্চয়ই লাগে।

একটা বালিশের জন্যে তাহলে পঁচিশটা পাখির আকাশে ওড়া বন্ধ হয়ে গেল?

আধ্যাত্মিক ধরনের কথা বলবি না তো আব্দুল্লাহ। এসব কথা আমার কাছে ফাজলামির মতো লাগে।

ফাজলামির মতো লাগলে আর বলব না।

যা তুই তোর ঘরে গিয়ে আরাম কর। চা-কফি কিছু খেতে চাইলে ইন্টারকমের বোতাম টিপে বাবুর্চিকে বলবি। ও এসে তোর যা লাগবে তা-ই দিয়ে যাবে।

তুমি কী করবে এখন? এই সময়ে বাইরে যাচ্ছ নাকি?

হু। বের হচ্ছি। কেন তোকে বললাম না, সকালে আমি একটু বের হই। দিনরাত ঘরে বসে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হয়। তুই তো আর এখন বের হচ্ছিস না?

না আমি এখন বের হব না।

তাহলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যাচ্ছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তালা লাগিয়ে যাবে মানে? বুঝলাম না?

খালা আমার চেয়েও অবাক হয়ে বললেন, তুই আমার পুরো বাড়িটায় একা থাকবি, তোকে তালা দিয়ে যাব না? লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র আছে চারদিকে।

ঘরে যদি আগুন-টাগুন লেগে যায় তখন কী হবে খালা? আমি তালাবদ্ধ ঘরে পুড়ে মরতে চাই না।

পুড়ে মরার কথা এখানে আসছে কেন? খামাখা আগুনই বা লাগবে কেন? আর যদি লাগে প্রতি ফ্লোরে ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে। অসুবিধা নেই।

তালা দেয়া অবস্থায় কতক্ষণ থাকতে হবে?

আমি না আসা পর্যন্ত থাকবি। আমি তো আর সারা জীবনের জন্যে চলে যাচ্ছি না। ঘণ্টা খানেক ঘোরাঘুরি করে চলে আসব। সামান্য কিছুক্ষণ তালাবদ্ধ থাকবি এতেই মুখ-চোখ শুকিয়ে কী করে ফেলেছিস।

খালা আমি হচ্ছি মুক্ত মানুষ। সব সময়ই স্বাধীনভাবে সবুজরঙা পাখি হয়ে উড়তে চাই। এটাই সমস্যা।

হয়েছে। এখন পাখি হয়ে ওড়া লাগবে না। বিছানায় শুয়ে বই-টই পড়, টিভি দেখ; আমি তোকে কফি দিতে বলে যাচ্ছি।

কী টিভি দেখব? আমি তো টিভি দেখি না।

ইউটিউবে লেকচার টেকচার দেখ।

আমি কিছু না বলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘটাং ঘটাং শব্দে তালা দেয়ার আওয়াজ পেলাম। এ বাড়ির সবকিছু আধুনিক হলেও তালাগুলো সম্ভবত মান্ধাতার আমলের। বড্ড শব্দ করে।

বিশ-পঁচিশ পাখির ওড়ার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া যে বালিশ সেই পালকের বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছি। আমাকে কফি দেয়া হয়েছে। কফি দিয়ে গেছে ইংলিশ বাবুর্চি। কফি দেয়ার সময় চাইনিজ খাবার কী খাব বাবুর্চি জানতে চেয়েছিল; ধবধবে সাদা পোশাক, হাতে নোট বুক, পেন্সিল। আমি গম্ভীর গলায় বলেছি, ঝিনুক অথবা সামুদ্রিক সাপ দিয়ে হট অ্যান্ড সাওয়ার করে একটা স্যুপ খাব।

বিদেশিরা শুনেছি ঝিনুক খুব শখ করে খায়; আর কোরিয়ানরা সাপ। তবে আমার বেলায় সামুদ্রিক সাপ হতে হবে। আমি কখনো খেয়ে দেখিনি। হানাফি মাযহাব ছাড়া বাকি সব মাযহাবে বলা আছে—নির্দিষ্ট কয়েকটি ছাড়া—সমুদ্রের নিচের সকল প্রাণীই হালাল। শুধু হানাফি মাযহাবে বলা আছে যে, শুধু মাছ হলেই খাওয়া যাবে। ঝিনুক বা সমুদ্রের নিচে বসবাস করা সাপ খাওয়া যাবে কি না, এটা নিয়ে শুনেছি আলেমদের মধ্যে ইখতিলাফ আছে।

বাবুর্চি হতভম্ব গলায় বলল, স্যারের কথা বুঝতে পারলাম না। কিসের স্যুপ?

আচ্ছা সাপ বাদ দিন; ঝিনুকের স্যুপ। ঝিনুকের খোলস ফেলে দিয়ে ভেতরের নরম অংশটা দিয়ে স্যুপ তৈরি করতে হবে। সাথে মাশরুমও দিতে পারেন। বেবি কর্ন দিবেন। সয়া সস অল্প দেবেন। ওয়েস্টার সস দেবেন। ঝিনুকের গন্ধটা মারার জন্যে যতটুকু লাগে ঠিক ততটুকু। বেশিও না, কমও না।

আমি স্যার আসলেই আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

বুঝতে না পারলে বিদায় হয়ে যান।

জি আচ্ছা স্যার।

তালাবদ্ধ বাড়িতে পড়ে আছি। মনে হচ্ছে আইনস্টাইন বাবু আমার পাশে বসে আছে। আইনস্টাইনের 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' আমার ওপর কাজ করতে শুরু করেছে। সময় থেমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। টাইম ডাইলেশন। তালাবদ্ধ অবস্থায় যে এর আগে থাকিনি—তা না। টেররিস্ট সন্দেহে হাজতে কাটানো রাতের সংখ্যাও কম না। তবে হাজত তালাবদ্ধ থাকবে এটাই স্বীকৃত সত্য বলে খারাপ লাগে না। তালা খোলা অবস্থায় হাজতে বসে থাকাটা বরং অস্বস্তিকর। কিন্তু এই আলিশান বাড়িতে তালাবদ্ধ থাকা অসহনীয়।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি বেহেশত কেমন হবে? কোনো তালার ব্যবহার কি সেখানে থাকবে? আল্লাহ যদি জান্নাত নসিব করেন, তাহলে নিজের ঘর থেকে বের হয়ে যখন ঘুরতে যাব তখন কি সদর দরজায় তালা দিয়ে যাব? নাকি খোলা রেখেই যেতে হবে। তখন কি আদৌ ঘরের সদর দরজা বলে কিছু থাকবে। অন্য ডাইমেনশনের কোনো কিছু এখানে বসে ভেবেচিন্তে বের করা সম্ভব না। যতটুকু আল্লাহ মানুষকে বোঝানোর জন্যে বলে দিয়েছেন সেটা দিয়ে একটা ধারণা নেয়া যেতে পারে। আর ওইটুকুতেই এখন সন্তুষ্ট থাকতে হবে। জান্নাতে না গিয়ে জান্নাতকে বুঝে ফেলা অসম্ভব। খালার নামায-ঘরে প্রচুর বই দেখলাম। এ বাসায় যতদিন আছি এর মধ্যে সূরা বাকারা মুখস্থ করার পাশাপাশি জান্নাত নিয়ে ভালো করে আরও কিছু তথ্য জোগাড় করে নিতে হবে। আরও ভালো করে পড়ে ফেলতে হবে। জান্নাতে নাকি হাটের মতো একটি জায়গা থাকবে, সেখান থেকে ঘুরে এলে মানুষ আরও সুন্দর হয়ে যাবে।

কফি খাচ্ছি, কফিতে কোনো স্বাদ পাচ্ছি না। স্বাদ যেমন নেই, গন্ধও নেই। একটু পর পর চোখ চলে যাচ্ছে ঘড়ির দিকে। ঘড়ি মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে আছে।

আমার বিখ্যাত বাবা আমাকে বন্দী থাকার ট্রেনিং অতি শৈশবে দিয়েছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল, মহাপুরুষ বানানোর জন্যে এই ট্রেনিং খুবই জরুরি। তার ধারণা ছিল বন্দী না থাকলে মানুষ স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝতে পারে না। বাবার জন্যে আমার কষ্ট হয়। আমার বাবা আমাকে মহাপুরুষ বানাতে চেয়েছিলেন। তিনি আমাকে নিয়ে নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। তিনি আস্তিক ছিলেন, অথচ একবারও ঠিকভাবে ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা করেননি। বাবা যদি পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে মারা যেতেন, তাহলে ভালো লাগত। বাবার জন্যে যখন আমার কষ্ট হয় তখন আমি আমাদের নবিজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা ভাবি। ওনার আপন চাচা ঈমান নিয়ে মরতে পারেননি। নবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার পিতৃতুল্য চাচাকে জান্নাতে পাবেন না। নবিজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই কষ্টের কাছে

আমার মতো তুচ্ছ আব্দুল্লাহর কষ্ট তো কিছুই না।

একদিনের কথা। বাবা আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিলেন। তখন আমি অনেক ছোট। শৈশব চলছে। ক্লাস ফোরে পড়ি। অন্য যেকোনো ছেলে হলে দারুণ হবাক হতো। আমি তেমন অবাক হলাম না। ছোটবেলা থেকেই বাবা আমাকে নিয়ে উদ্ভট উদ্ভট সব কাজ করতেন। বাবার পাগলামির সঙ্গে ততদিনে আমার ভালো পরিচিতি হয়ে গিয়েছিল। আমার ধারণা সন্ধ্যা নাগাদ তালা খোলা হবে। সকাল গড়াল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। আতঙ্কে অস্থির হয়ে লক্ষ করলাম সন্ধ্যার পর পর বাবা বাড়ি ছেড়েই চলে গেলেন। যাবার সময় পুরো বাড়ির মেইন সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ক্লাস ফোরে পড়া আমাকে একা রেখে বাবা নিরুদ্দেশ হলেন। এটা ছিল আমার বাবার ভয় জয় করার ট্রেনিং-এর প্রাথমিক অংশ। পরে যখন বাবার মৃত্যুর পর তার ডাইরিটা হাতে পাই সেখানে এই দিনের ব্যাপারে বাবা কী লিখেছিলেন সেটা পড়ে দেখার সৌভাগ্য হয়। তার ডাইরিতে তিনি লিখেছিলেন,

অদ্য রজনীতে সুবোধকে (সুবোধ আমার পূর্বের নাম, ঈমান আনার পর আমি নিজেকে আব্দুল্লাহ পরিচয় দিতেই বেশি পছন্দ করি) ভয় জয় করিবার প্রস্তুতিসূচক ট্রেনিং দেওয়া হইবে। আমি অনেক চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছি। এবং গবেষণা করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহা হইল মানুষের ভয় পায় অদেখাকে। অজানাকে। আর তাই তাদের প্রধান ভয় অন্ধকারকে। কারণ অন্ধকার হইল অদেখা অজানার স্বরূপ। আমার ধারণা এই অন্ধকারের ভয় মানুষ অন্য কোনো ভুবন হইতে লইয়া আসিয়াছে। অজানার ভয়কে জয় করা সম্ভব না, তবে অন্ধকারের ভয়কে জয় করা সম্ভব। আর অন্ধকারকে জয় করার অর্থ সমস্ত ভয় জয় করা। অন্ধকার জয় করা বিষয়ক প্রাথমিক ট্রেনিং সুবোধ কীভাবে গ্রহণ করিবে বুঝিতে পারিতেছি না। এই শক গ্রহণ করিবার মানসিক শক্তি কি সুবোধ নামক এই শিশুটির আছে? বুঝিতে পারিতেছি না। কাহাকেও বাহির হইতে দেখিয়া তাহার মানসিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। সেই দিব্যদৃষ্টি স্রষ্টা মানব সম্প্রদায়কে দেন নাই...

আমি ইন্টারকম টিপে বাবুর্চিকে ডাকলাম। ইন্টারভিউ নেয়ার ভঙ্গিতে বললাম, কী নাম যেন তোমার?

ইদ্রিস।

শুরুতে তাকে আপনি করে বলেছিলাম; এখন তুমি।

শোনো ইদ্রিস, নামায পড়া হয়।

জি স্যার।

কোথায় পড়ো, নামায-ঘরে?

জি না স্যার, ওখানে শুধু ক্লিনারের এক্সেস আছে, আমাদের এমনিতে ওই ঘরে ঢোকা নিষেধ।

তাই নাকি!

জি।

আজ থেকে এই নিষেধাজ্ঞা উইথড্র করা হলো। নামাযের ঘরে ঢোকার নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে না।

জি স্যার।

শোনো, যোহরের নামায একসাথে জামাতে পড়ব; মালি আর একজন বাবুর্চি আছে না?

জি স্যার।

ওরা কি সবাই মুসলমান?

সবাই মুসলমান স্যার।

ওদের নিয়ে আসবা, একসাথে জামাতে নামায আদায় করা হবে। আর আজকে বসে জান্নাত কেমন এই সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করব, ঠিক আছে!

ম্যাডাম রাগ করবে স্যার।

রাগ করবে না, সেই ব্যাপার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আচ্ছা ইদ্রিস, এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে? বাথরুম থেকে পাইপ বেয়ে নেমে পড়া বা এ-জাতীয় কিছু?

জি না।

ছাদে উঠে, ছাদ থেকে অন্য ছাদে লাফিয়ে যাওয়া যায় না?

জি না স্যার। এখানে রাজউকের আইন মেনে বাড়ি করা হয়েছে। গা লাগোয়া বাড়ি নেই।

তাহলে টেলিফোন নিয়ে আসো। দমকল অফিসে টেলিফোন করে দিই। ওরা বাহিনী নিয়ে এসে তালা খুলে উদ্ধার করবে। অথবা ৯৯৯ এ ফোন করে পুলিশকেও ব্যাপারটা জানানো যায়।

টেলিফোন নেই স্যার।

টেলিফোন নেই মানে কী?

এই বাড়িতে সব আছে টেলিফোন নেই। টেলিফোনে লোকজন বিরক্ত করে, ম্যাডামের ভালো লাগে না।

ও আচ্ছা।

স্যার আরেক কাপ কফি এনে দিই? চাও খেতে পারেন স্যার। গরুর দুধের চা। আপনি চিন্তা করবেন না। ম্যাডাম চলে আসবেন। উনি বেশিক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকেন না, চলে আসেন। কফি দেবো স্যার?

দাও।

বাবুর্চি কফি এনে দিলো। আমি কফি খেয়ে বাবুর্চি মালিকে নিয়ে সময় কাটালাম। নামাযের ঘরে জামাতে নামায আদায় করলাম। জান্নাতে কী কী থাকবে তা নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বললাম।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল এখনই জান্নাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাচ্ছে সবাই। মানুষ বড় অদ্ভুত জীব—নগদ জান্নাত চায় ঠিকই, কিন্তু জান্নাতের জন্যে কষ্ট করতে চায় না।

আমি মাগরিবের নামাযের পর বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। খালা এখনো ফেরেননি। তার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই ঘুম যখন ভাঙল

তখন দেখি রাত হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার।

কিরে ঘুম ভেঙেছে?

রাহেলা খালা ঢুকে বাতি জ্বালালেন। মাথায় বিশাল কাপড় টানা। যে কেউ দেখলে মনে করবেন পর্দা করতেই মাথায় কাপড় দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা অন্য। খালার চুল পড়ে যাচ্ছে। আগে পট চুল পরে ঘুরতেন, পট চুলে এলার্জি হয় দেখে ইদানীং আর পট চুল পরে ঘুরেন না। হিজাব করে ঘুরেন। হিজাব ছাড়া খালাকে বীভৎস লাগে। এক এক জায়গায় চুল উঠে যাওয়ায় ব্যাপারটা আরও বেশি বিদঘুটে হয়ে গেছে।

ঘরে ফিরে দেখি তুই মরার মতো ঘুমোচ্ছিস। তাই আর ঘুম ভাঙালাম না। ঘুমের মূল্য কী তা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি। এতক্ষণ ধরে কেউ ঘুমোতে পারে তাও জানতাম না। তোর কোনো অসুখ-বিসুখ নেই তো?

ক'টা বাজে খালা?

সাড়ে দশটার কাছাকাছি। তুই অনেকক্ষণ ঘুমোলি। খিদে লেগেছে নিশ্চয়ই? হাত-মুখ ধুয়ে আয়, ভাত খাই।

আমি উঠলাম। শান্ত গলায় বললাম, খালা নামাযের ঘরটায় আজকে তোমার অনুমতি ছাড়া সবাইকে নিয়ে নামায পড়েছি।

সবাইকে নিয়ে মানে?

মানে তোমার বাবুর্চি, মালি—ওদের নিয়ে নামায পড়েছি। তোমার বাংলা বাবুর্চির তেলাওয়াত খুবই সুন্দর। তুমি যে রেকর্ডারটা বাজাও তা ওনার অবিকল। কোনো একদিন শুনে দেখো। আর শোনো খালা, নামাযের ঘর যখন বানিয়েছ এখানে নামায পড়তেও দিতে হবে।

হু বুঝলাম। ঠিক আছে। ওরা যে নামায-কালাম পড়ে সেটা তো আমি জানতামই না। দামি দামি অনেক কিছু আছে ঘরে, যদি নামাযের কথা বলে চুরিধারি করে। এই জন্যে ওদেরকে আমার অনুপস্থিতিতে ঢুকতে মানা করেছিলাম। তুই যখন বলছিস, আজকে থেকে আর ওদের মানা নেই। মানা উইথড্র করা হলো।

থ্যাংক ইউ খালা।

আয় খেয়ে নিই।

খেয়েদেয়ে আমি একটু বের হব।

বের হতে চাইলে বের হবি। আমি কি তোকে আটকে রেখেছি নাকি? বাবুর্চি বলছিল, তালা দিয়ে যাওয়ায় তুই নাকি অস্থির হয়ে পড়েছিলি। আশ্চর্য। তুই কি ছেলেমানুষ নাকি? তুই আবার তাকে বলেছিস, সাপ না হলে ঝিনুকের স্যুপ খেতে চাস। বাবুর্চিটা বোকা টাইপের, ও তোর কথাকে সিরিয়াসলি নিয়েছে। ঠাট্টা বুঝতে পারেনি।

ঝিনুকের স্যুপ তৈরি করেছে? আমি ঠাট্টা করিনি, আসলেই খেতে চেয়েছিলাম।

তুই দেখি আচ্ছা পাগল। হারাম জিনিস খাবি নাকি?

সব মাযহাবে হারাম না তো খালা। হাঁ, তবে হানফি মাজহাবে খাওয়া নিষিদ্ধ এটা ঠিক।

খালা কিছু বললেন না। শান্ত গলায় বললেন, আয় খেতে আয়। খেতে খেতে আমার ভয়ংকর গল্পটা বলব। তুই কিন্তু আবার এই গল্প সবাইকে বলে দিস না। এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত গল্প যা আমি তোর সাথে শেয়ার করছি। বুঝতে পারছিস।

হ্যাঁ খালা বুঝলাম।

ডাইনিং রুম ছাড়াও ছোট্ট একটা খাবার জায়গা আছে। শ্বেতপাথরের টেবিলে দুটা মাত্র চেয়ার। মোমবাতি জ্বালিয়ে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের ব্যবস্থা। টেবিলে নানান ধরনের পদ সাজানো।

বাবুর্চি পাশে দাঁড়িয়েছিল। খালা বললেন, এই তুমি চলে যাও, তোমাকে আপাতত লাগবে না। লাগলে ডাক দেয়া হবে। আর খাওয়া শেষ হলে ঘণ্টা বাজাব, তখন সব পরিষ্কার করবে।

ঘণ্টারও ব্যবস্থা আছে?

আছে, সব ধরনের ব্যবস্থাই আছে। টেলিফোন ছাড়া। বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু কর। বাবুর্চির রান্না কেমন বলবি। রান্না পছন্দ না হলে ব্যাটাকে বিদায় করে দেবো। ব্যাটার চোখের চাউনি ভালো না। স্যুপটা কেমন?

ভালো, খুব ভালো, আলহামদুলিল্লাহ।

তুই তো স্যুপটা ছুঁয়েও দেখিসনি। মুখে না নিয়েই বলে ফেললি ভালো?

গন্ধে গন্ধে বলে ফেলেছি। চায়নিজ খাবারের আসল স্বাদ গন্ধে। গন্ধ তো মা শা আল্লাহ্ ভালোই আসছে। রান্না ঠিক আছে। বাবুর্চি রেখে দাও।

হুম। রান্না ভালো ওর কিন্তু চোখের চাউনিটা যে খারাপ! মাঝে মাঝে ভয়ংকর করে তাকায়।

ওকে বলবে, সব সময় যেন সানগ্লাস পরে থাকে।

বুদ্ধিটা খারাপ না। ভালো বলেছিস আব্দুল্লাহ। এটা আমার মাথায় আসেনি। কথায় আছে না—এক মাথা থেকে দুই মাথা ভালো। আসলেই তা-ই।

হু। আরেকটা সলিউশন আছে—পুরোপুরি পর্দা করা শুরু করে দাও। এদের সামনে আসতে হলে একদম কালো বোরখা পরে আসবে। খাওয়ার সময় এদের কাউকে সামনে রাখবে না। এরা সামনে থাকলে তুমি সানগ্লাস পরে থাকবে।

এটা আমি পারব না। বোরখায় গরম লাগে অনেক।

জাহান্নামের আগুন তো এই গরমের চেয়েও অনেক বেশি গরম খালা।

হয়েছে আপনাকে আর জাহান্নামের ভয় দেখাতে হবে না। এখন আমার সমস্যাটা শোন। খুব মন দিয়ে শুনবি।

আয়েশ করে খাওয়া শেষ করি তারপর শুনব।

খাওয়া শেষ করে শোনা লাগবে না। খেতে খেতেই শোন।

আমি আবার চুপচাপ খেতে পারি না। ব্যাপারটা কী হয়েছে! তোর খালু মারা যাবার পর বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল সব আলতু-ফালতু লোকে। ওমুক আত্মীয়, তমুক আত্মীয়। এই সব আত্মীয়-স্বজন এসে এক্কেবারে খুঁটি গেড়ে বসে গেল। সবার নজর তোর খালুর সম্পত্তিতে। টাটকা মধু পড়ে আছে, পিঁপড়ের দল চারদিক থেকে এসে পড়েছে। আমি খুব বুদ্ধি করে একে একে ঝেঁটিয়ে সব বিদেয় করলাম। বাড়ি খালি হয়ে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা গেটে তালার ব্যবস্থা করলাম। এক জনের জায়গায় দুজন দারোয়ান

রাখলাম। চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। কাউকে ঢুকতে দেবে না। কেউ যদি ঢুকে—সঙ্গে সঙ্গে চাকরি নট। আমার যদি কোনো আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করার দরকার হয় বা কথা বলার দরকার হয়, তাহলে আমি নিজেই তাদের কাছে যাব। কারও আমার এখানে আসতে হবে না। যখন সবার এই বাড়িতে ঢোকা একরকম নিষিদ্ধ করে দিলাম, তখন শুরু করল টেলিফোনে যন্ত্রণা দেয়া। লতায়-পাতায়-ডগায়-মগডালের আত্মীয়রা খালি ফোন করে বিরক্ত করে। দিলাম তখন টেলিফোন লাইন কেটে।

এত বড় বাড়িতে আমি তখন হয়ে গেলাম একা। একটু যে ভয় ভয় লাগে না, সেটা না। ভয় লাগে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের যন্ত্রণার চেয়ে ভয় পাওয়া ভালো। লক্ষ গুণ ভালো।

তারপর একদিন কী হয়েছে শোন। রাত এগারোটার মতো বাজে। বিছানায় শুতে যাব। এই সময়ে দেখলাম খুব মশায় কামড়াচ্ছে। দরজা-জানালায় নেট আছে; নেটগুলো সন্ধ্যার আগেই লাগিয়ে দেয়া হয়। সেই দিনও লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারপরও এত মশা কোত্থেকে এল আল্লাহই জানেন।

আমার মেজাজ হয়ে গেল প্রচণ্ড রকম খারাপ। মশারি খাটিয়ে ঘুমাতে আমার একদম ভালো লাগে না। তারপরও এত মশা দেখে, চিন্তা করলাম মশারি খাটাতে হবে। তখন আমার ঘরে একটা কাজের মেয়ে ছিল বোবা। ওকে বললাম মশারি খাটিয়ে দিতে। ও মশারি খাটিয়ে দিলো। মেজাজ টেজাজ খারাপ করে ঘুমোতে যাচ্ছি। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছিল। সেই লাইটের সুইচ অফ করে বিছানার কাছে গেলাম। বিছানায় গুঁজে দেয়া মশারি তুলে দেখি মশারির ভেতর তোর খালু সাহেব বসে আছে। গুটিসুটি মেরে বসা। মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি সেইদিন চিৎকার দিয়েই অজ্ঞান হয়ে পরে গিয়েছিলাম। সেই দিন থেকে শুরু। এখন তোর খালু সাহেব প্রায় প্রতিদিনই আমার সামনে আসে। কখনো তাকে দেখি খাটের নিচে, কখনো বাথরুমের বাথটাবে; একদিন পেলাম ডিপ ফ্রিজে।

কোথায়? ডিপ ফ্রিজে?

হ্যাঁ। সাধারণত ডিপ ফ্রিজ আমার খোলা হয় না। সব সময় বাবুর্চি মূলত ডিপ ফ্রিজটা খোলে। সেদিন কী মনে করে যেন ফ্রিজের ডালাটা নিজেই তুললাম। দেখি, একেবারে খালি ফ্রিজ। সেখানে ও বসে ঠান্ডায় থরথর করে কাঁপছে। এই হলো ব্যাপার বুঝলি। এরপর থেকে রাতে ঘুমোতে পারি না।

খালু সাহেব কে কি রোজই দেখো?

হুম। প্রায়ই দেখি।

এটা কি তোমার স্বপ্ন?

আরে না গাধা। স্বপ্ন না।

হুম! আজ দেখেছ?

এখনো দেখিনি। তবে আজকেও যে দেখব এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মানেটা কী বল তো আব্দুল্লাহ? এই অত্যাচারের কারণ কী? ভূত-প্রেত বলে সত্যি কি কিছু আছে? মানুষ মরলে কি আসলেই ভূত হয়?

আমি দেখলাম, রাহেলা খালা আর কিছু খেতে পারছে না। মুখ শুকিয়ে গেছে।

হাত কাঁপছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আব্দুল্লাহ কথা বলছিস না কেন? মানুষ মরলে কি ভূত হয়ে যায়?

খালা তুমি কি একাই ওনাকে দেখো, না আরও অনেকেই দেখে?

সবাই তো দেখে। বোবা যেই কাজের মেয়েটা ছিল, ওই মেয়েটাও দেখেছিল। দেখে চাকরি টাকরি ছেড়ে চলে গেছে। আমার সাথে যারা আছে তারাও নিশ্চয়ই দেখেছে। এরা কেউ রাতে দোতলায় ওঠে না। তুই যখন এই বাড়িতে থাকা শুরু করেছিস, তুইও দেখবি।

আমি খালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই প্রথম রাহেলা খালাকে বেশ অসহায় মনে হচ্ছে। এবং তার জন্যে এই প্রথম মায়া হচ্ছে।

রাহেলা খালার রাজপ্রাসাদে দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ পার করে দিলাম। ঝুট-ঝামেলাহীন, সমস্যামুক্ত জীবনযাপন। আহার, বাসস্থান, নামায নামক কয়েকটি মৌলিক দাবি বেশ ভালোভাবেই মিটে গেছে। এই তিনটি দাবি মিটলেই মানুষের দরকার হয় বিনোদন। তখন বিনোদনের দাবি ওঠে। খালার বাসায় বিনোদনের ব্যবস্থার অভাব নেই। বিশেষ করে নামাযের ঘরটা সত্যিই আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। খালা বের হলেই ওই ঘরে আমরা বসে নানা গল্প করি। মালি ও দুই বাবুর্চির সাথে এখন আমার বেশ সখ্য। আমার ভালোই লাগছে। প্রথম দিন থেকে জান্নাত নিয়ে পড়া শুরু করেছিলাম। পড়তাম আর খালা না থাকলে সবাইকে নিয়ে বসে জান্নাতের বিচার-বিশ্লেষণ করতাম। এখন চলছে জাহান্নাম পর্ব। ভয়াবহ ব্যাপার! জান্নাতের আলোচনায় সবার মুখ যেমন উজ্জ্বল থাকত, জাহান্নামের আলোচনায় ততটাই থাকে গম্ভীর। আমি এখানে ভালোই আছি।

দ্রুতগতিতে ট্রাক আসতে দেখলে মানুষ জান বাঁচাতে রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু সেই খোলা ট্রাকের ওপর সওয়ার হয়ে ভ্রমণের আনন্দ অন্যরকম। আমার অবস্থা হয়েছে খোলা ট্রাকের ওপর ভ্রমণ করা মুসাফিরের মতো। রাহেলা খালার সঙ্গে গল্প-গুজব করতে এখন বেশ ভালোই লাগে। শুধু রাতের বেলা কিছু সমস্যায় পরতে হয়। রাত একটু গভীর হলেই রাহেলা খালা আমার দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলেন—সুবোধ, এই সুবোধ, ঘুমিয়ে পরেছিস নাকি। একটু আয় তো, দেখে যা, নিজের চোখে দেখে যা; ও বসে আছে, আমার খাটের ওপর পা তুলে বসে আছে। আর বিশ্রীভাবে হাসছে।

আমি হাই তুলতে তুলতে বলি, থাকুক না বসে। অসুবিধা কী? তুমিও তার পাশে পা তুলে বসে থাকো। এ ছাড়া আর করার কী আছে?

পুরোপুরি নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন সম্ভব না। সব জীবনেই কিছু ঝামেলা থাকবে। এটাই নিয়ম। আপনি কাবাব খাবেন। দেখবেন কাবাব যত ভালোই হোক, কাবাবের এক কোনায় ছোট একটা হাড্ডির টুকরো থাকবেই।

গগন আলী মিয়া প্যালেসটি যদি কাবাব হয়, তাহলে রাতে রাহেলা খালার হইচই, ছুটাছুটি, চিৎকার হলো গগন আলী প্যালেসের হাড্ডির টুকরো। রাহেলা খালার রাতের এই ছুটাছুটি, চেঁচামেচিকে অগ্রাহ্য করতে পারলে গগন আলী মিয়া প্যালেসে মাসের পর মাস থাকা যায়। তা ছাড়া ওই বাড়ির বাবুর্চিদ্বয়ের সাথে সখ্য হওয়ায়, সময়ও বেশ ভালো যাচ্ছে। ভালো-মন্দ খাবার না চাইতেও আমার ঘরে চলে আসছে। এক সকালে ইংলিশ বাবুর্চি আমার জন্যে বিরাট এক বাটি স্যুপ বানিয়ে এনে বলল, আপনি একবার ঝিনুকের স্যুপ খেতে চেয়েছিলেন—বানাতে পারিনি। আজ বানিয়েছি। খেয়ে দেখুন স্যার, আপনার পছন্দ হবে। সঙ্গে মাশরুম আর ব্রকোলি দিয়েছি।

বাটির ঢাকনা খুলে আমার নাড়িভুঁড়ি পাক দিয়ে উঠল। সাদা রঙের স্যুপ, ভেতরে থকথকে ঝিনুকের ভেতরের নরম মাংসল দেহ দেখা যাচ্ছে। একটা ঝিনুকের খোসা আবার উল্টো হয়ে আছে।

বাবুর্চি শান্ত স্বরে বলল, সস টস কিছু লাগবে স্যার?

আমি বললাম, কিছুই লাগবে না।

যদিও ঝিনুকের স্যুপ খাওয়ার একটা ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন দেখে কেমন যেন লাগছে। আর হানাফি মাযহাব অনুসারে এটা হালাল হবে না। তাই আর খেলাম না। প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে শরিয়াহর অনুসরণ করতে চাইলে মাযহাবের সহিহ ফতোয়াগুলোর ওপর আমল করার কোনো বিকল্প নেই। বেচারাকে ধন্যবাদ দিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাসিমুখে বিদেয় করলাম।

রাহেলা খালা আমার প্রতি যথেষ্ট মমতা প্রদর্শন করছেন। সেই মমতার নিদর্শন হচ্ছে আমাকে বলেছেন,

ও আব্দুল্লাহ, তোর তো আবার রাত-বিরাতে হাঁটাহাঁটির স্বভাব আছে। নিজেকে যেদিন থেকে আব্দুল্লাহ পরিচয় দিতে শুরু করেছিস সেদিন থেকেই নাকি আবার গভীর রাতে মাসজিদে মাসজিদে গিয়ে পড়ে থাকিস। না হলে নাকি তোর পেটের

ভাত হজম হয় না। এখন থেকে গাড়ি নিয়ে হাঁটাহাঁটি করবি। মাসজিদে যাবি।

আমি বললাম, গাড়ি নিয়ে হাঁটাহাঁটি কীভাবে করব খালা?

পাজেরো নিয়ে বের হবি, যেখানে যেখানে হাঁটতে ইচ্ছে করবে ড্রাইভারকে বলবি, ড্রাইভার তোকে ওই এলাকায় নিয়ে যাবে। তুই ওকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে, হাঁটাহাঁটি করবি, মাসজিদে নামায পরবি।

এটা মন্দ হয় না।

কিছুদিন থেকে আমি পাজেরো নিয়ে হাঁটছি। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করছি—এই গাড়িতে বসলেই ছোট ছোট গাড়ি বা রিকশাকে চাপা দেয়ার প্রবল ইচ্ছে হয়। ট্রাক ড্রাইভার কেন অকারণে টেম্পো বা সিএনজির ওপর ট্রাক তুলে দেয় আগে কখনো বুঝিনি। এখন বুঝতে পারছি। নিজের সাথে যে কারিন (শয়তানের নাম; প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন করে শয়তান এসাইন করা আছে, এদের কারিন বলে) থাকে তার প্ররোচনা থাকে ব্যাপক। এখন মনে হচ্ছে দোষটা ট্রাক ড্রাইভারের হলেও আসল মজাটা নিয়ে নেয় কারিন। যখনই কেউ বড় হয়, কারিন তাকে প্ররোচিত করে তার থেকে ছোটকে পিষে ফেলতে। শয়তান এমনই প্রভাব বিস্তার করে মানুষের ওপর যে, বানরকে যিনি নিজের আদি পিতা মনে করেন সেই ডারউইন সাহেবও সারভাইভাল ফর দ্যা ফিটেস্ট তত্ত্ব দিয়ে বসে আছেন।

পাজেরো নিয়ে হাঁটতে বের হবার একটাই সমস্যা—গলিপথে হাঁটা যায় না। রাজপথে হাঁটতে হয়। এ রকম রাজপথে হাঁটতে বের হয়েই একদিন ইরামের সঙ্গে দেখা। সে বেশ হাত নেড়ে গল্প করতে করতে এক বেপর্দা মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছে। দূর থেকে দুজনকে খুব ঘনিষ্ঠজন বলেই মনে হচ্ছে। আমি পাজেরোর ড্রাইভারকে বললাম, এখান থেকে জোরে হর্ন দেন যাতে ওই যে দুজন হাঁটছে ওরা ফিরে তাকায়।

ড্রাইভার বিরক্ত গলায় বলল, এত দূর থেকে হর্ন দিলে এরা শুনবে না। আশেপাশের গাড়িগুলা বিরক্ত হইব।

তাহলে একটা কাজ করেন, এখানে ব্রেক করেন। আপনি নেমে গিয়ে ওই যে ছেলেটা মেয়েটার সাথে হাঁটছে ওই ছেলেটাকে গিয়ে বলুন, বস ডাকছে। যদি আপনার কথা শুনে সে আসতে না চায়, তাহলে গালে জোরে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেবেন। তারপর কলার ধরে নিয়ে আসবেন।

জি আচ্ছা।

ড্রাইভার গাড়ি ব্রেক করে নেমেছে। চড়-থাপ্পড় দেয়ার কথা বললে ড্রাইভারদের কাজের স্পৃহা বেড়ে যায়।

ড্রাইভার সাহেব।

জি স্যার।

বস ডেকেছে বলার দরকার নাই। বলবেন আব্দুল্লাহ ভাই ডাকে। আর বাকি সব ঠিক আছে। না এলে যা বলেছি তা-ই করবেন। কী, পারবেন না?

পারব না মানে কী বলেন স্যার। ঢাকার রাস্তায় বিশ বছর ধইরা গাড়ি চালাই, দুই একটারে রাস্তায় থাবড়া দেওয়া কোনো ব্যাপার না।

ঠিক আছে, যান।

ইরামের গালে থাবড়া বসাতে হলো না। সে মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল।

মেয়েটা কে ইরাম? তোমার বোন?

ইরাম শক্ত চোখে তাকিয়ে আছে, আমার কাছ থেকে রসিকতা মেনে নিতে পারছে না।

বোন হতে যাবে কেন?

এমনভাবে কথা বলছিলে দেখে মনে হলো খুব কাছের কেউ।

আপনি হুজুর মানুষ এই অনুভূতিগুলো আপনারা বুঝবেন না।

আমি কিঞ্চিৎ হেসে বললাম, প্রেমানুভূতি হুজুরদের প্রবল হয়। তারা বেশি রোমান্টিক হয়। কিন্তু তোমাদের এই ধরনের অবৈধ অনুভূতিগুলো থেকে হুজুররা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। শোনো বুঝে রবের বিরুদ্ধে যাওয়া থেকে না বুঝে রবের হুকুম মেনে নেয়াও ভালো।

আপনারা তাহলে না বুঝেই রবের কথা মেনে নেন!

হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে তা বলতে পারো। কারণ, বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা-গবেষণার পর যখন প্রমাণ পেয়েছি এবং বিশ্বাস করেছি যে, সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং ইসলাম আল্লাহ মনোনীত একমাত্র সত্য ধর্ম—এই দুটি বিষয় যখন লজিক দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে মেনে নিয়েছি, তখন থেকে আল্লাহর হুকুম এবং আহ্কামকেও বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া শুরু করেছি। রবকেই যখন মেনে নিয়েছি, রবের হুকুম মানব না কেন? কিছু হুকুমের পেছনে কী লজিক রয়েছে সেটা আমরা জানি; কিছু হুকুমের পেছনের লজিক জানি না। এতে কিছুই যায় আসে না। আমাদের রব আমাদের অমঙ্গল চান না।

আপনার সাথে তর্ক করব না। অভিদের বাড়িতে আপনাকে যেতে বলেছিলাম, আপনি যাননি। ওই বাড়িতে আপনাকে অতিশয় দরকার।

দরকার হলেও কিছুই করার নেই। আচ্ছা ইরাম আমি বিদায় নিচ্ছি।

ইরাম কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আপনি এখন চলে গেলে আর আপনার দেখা পাব না। অভির আপনাকে ভীষণ দরকার।

তাহলে দেরি করে লাভ নেই, উঠে এসো। চলো একসাথে যাই।

এই গাড়িটা কার?

গাড়িটা কার—এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। গাড়িতে কে বসে আছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। তুমি দেরি করছ ইরাম।

আপনি আসলে চেষ্টা করছেন সোনিয়া থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে—কেন বলুন তো।

তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি ইরাম।

আমি বেঁচেই আছি।

সোনিয়া বোধ হয় কিঞ্চিৎ বিরক্ত। দূর থেকে গলা উঁচিয়ে ইরামকে ডাকছে।

আমি বললাম, যাও ইরাম, তোমাকে ডাকছে।

ইরাম দোটানায় পড়ে গেল। আমি ড্রাইভারকে বললাম, চলেন যাওয়া যাক।

ড্রাইভার হুস করে বের হয়ে গেল। যতটা স্পিডে তার বের হওয়া উচিত তার চেয়েও বেশি স্পিডে বের হলো। মনে হচ্ছে সেও খানিকটা অপমানিত হয়েছে। যাকে থাবড়া মারার কথা সেই লোক পাজেরোর মতো গাড়িটাকে অগ্রাহ্য করল।

এখন কোন দিকে যামু স্যার?

এখন একটা মাসজিদের সামনে রাখবেন। আজ রবের কাছে বিশেষ কিছু চাওয়ার আছে।

দুপুরের দিকে আমি আমার পুরোনো মেসে গেলাম। জহুরুল সাহেবের এখন কী অবস্থা। চাকরি-বাকরি পেলেন কি না, খোঁজ নেয়া দরকার। তবে তার চাকরি হবার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না। তবে আশার কথা হলো, জহুরুল সাহেবের আল্লাহর করুণার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে। মনে হচ্ছে চাকরি একটা হয়ে যেতেও পারে। মানুষের সব থেকে বড় শক্তি হচ্ছে তার বিশ্বাস, তার ঈমান।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর জহুরুল সাহেব দরজা খুললেন। তার হাসি-খুশি ভাব আর নেই। মুখ দারুণ মলিন। চোখ কোটরে বসে গেছে। এই কদিনেই শরীর ভীষণ ভেঙে পড়েছে। তার গোলগাল মুখটা এখন আর গোলগাল দেখাচ্ছে না। কেমন লম্বাটে হয়ে গেছে।

কেমন আছেন জহুরুল সাহেব? খবর কী আপনার?

খবর তেমন একটা ভালো না আব্দুল্লাহ ভাই।

কেন? কী হয়েছে বলুন তো?

ছোট মেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে ভাই। গত পরশু দিন পেয়েছি। আমার স্ত্রীর শরীরটা খুব খারাপ করেছে। ছোট মেয়ের চিঠি পাওয়ার পর থেকে কিছুই ভালো লাগছে না। কিছু খেতেও পারছি না, ঘুমোতেও পারছি না।

তাহলে এখনো ঢাকায় বসে আছেন কেন? আপনার তো বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। আপনার পরিবারের কাছে।

কীভাবে যাই ভাই বলেন? ইয়াকুব আগামীকাল বিকেলে দেখা করতে বলেছেন,

তার সাথে দেখা না করে যেতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় ইয়াকুব সাহেব আপনার চাকরির ব্যবস্থা করেছে।

জি ভাই। আমার এই চাকরিটা খুবই দরকার। চাকরি না পেলে সবাই না খেয়ে মরব। আমি খুবই গরিব মানুষ আব্দুল্লাহ ভাই। কত শখ ছিল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকব। অর্থের অভাবে সম্ভব হয় নাই। একবার মিরপুরে একটা বাসা প্রায় ভাড়া করে ফেলেছিলাম। দুই রুমের একটা সুন্দর ফ্ল্যাট। ছোট্ট একটা বারান্দা আছে। রান্নার করার জন্যে যে ঘরটা, সেটাও ছোট্ট কিন্তু ছিমছাম সুন্দর। ঢাকা শহরে বাড়ির সামনে কোনো জায়গা থাকে না। ওই বাড়িটার সামনে জায়গা আছে। বাড়ির মালিকের ছোট্ট একটা বাগান আছে। বাগানের ভেতর বড় আমগাছের ডালে দোলনা বাঁধা। এত পছন্দ হয়েছিল যে, ভেবেছিলাম কষ্ট করে হলেও সবাইকে নিয়ে ওই বাড়িটায় থাকব। বাড়ির মালিক ছয় মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স চাইলো। কোথায় পাব ছয় মাসের অ্যাডভান্স, বলুন দেখি!

হুম। তা তো বটেই।

আব্দুল্লাহ ভাই, আমার ছোট মেয়ে যেই চিঠিটা লিখেছে। আমার ইচ্ছে আপনি একটু চিঠিটা পড়ে দেখবেন।

কেন বলুন তো?

আমার মেয়ে মাত্র ক্লাস ফোরে পড়ে। কিন্তু ভাই চিঠিটা পড়লে মনে হয় না। মনে হয় কলেজ-পড়ুয়া মেয়ের চিঠি। দুটা বানান অবশ্য সে ভুল করেছে।

আচ্ছা দিন দেখি।

জহুরুল সাহেব তার ক্লাস ফোরে পড়া মেয়ের চিঠি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

"আমার অতিপ্রিয় বাবা,

বাবা, মার অনেক অসুখ করেছে। প্রথমে এই অবস্থায় বাসায় ছিল, তারপর তার অবস্থা অনেক খারাপ হয়। পাশের বাড়ির মজনু ভাইয়া তাই মাকে হাসপাতালে ভর্তি



করেছে। ডাক্তাররা বলেছে এখানে চিকিৎসা তেমন হবে না। ঢাকায় নিয়ে যেতে বলেছে। বাসায় সবাই কান্নাকাটি করছে।

তুমি টাকা পাঠাওনি কেন বাবা? মা প্রথম ভেবেছিল পোস্টাফিসে কোন একটা সমস্যা হয়েছে। সে রোজ পোস্টাফিসে খোজ নিতে যায়। তারপর মা কোত্থেকে যেন শুনল তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ।

বাবা, সত্যি কি তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ? সবাই তো চাকরি করছে বাবা, তুমি চাকরি ছেড়ে দিলে কেন? তুমি চাকরি করছ না শুনে মা তেমন কান্নাকাটি করেনি, কিন্তু বড় আপা এমন কান্না কেঁদেছে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। বড় আপা কাঁদে আর বলে, 'আমার এত ভালো বাবা। আমার এত ভালো বাবা।' আমি বেশি কাঁদিনি। কারণ আমি জানি তুমি আল্লাহর জন্যে চাকরি ছেড়েছ। সুতরাং আল্লাহ তোমাকে খুব ভালো একটা চাকরি দেবেন। কারণ আমি নামায পড়ে দোয়া করেছি। বাবা, আমি নামায পড়া শিখছি। ছোট আপা বলেছে আত্তাহিয়াতু ছাড়া নামায হয় না। ঐ দোয়াটা এখনো মূখস্থ হয়নি। এখন মূখস্থ করছি মূখস্থ হলে আবার তোমার চাকরির জন্যে দোয়া করব।

বাবা, মার শরীর খুব খারাপ। এত খারাপ যে, তুমি যদি মাকে দেখে চিনতে পারবে না। মায়ের জন্যে দোয়া করো। আর তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো বাবা।

—ইতি তোমার অতি আদরের মেয়ে

নাজিয়া বেগম

ক্লাস ফোর

রোল নং ১।"

চিঠি পড়েছেন আব্দুল্লাহ ভাই?

জি।

মেয়েটা পাগলি আছে ভাই। চিঠির শেষে সব সময় তার বিস্তারিত তথ্য দেয়। কোন ক্লাস, রোল নং কত, লিখে দেয়। ফার্স্ট হয় তো, এই জন্যে বোধ হয় লিখতে তার ভালো লাগে।

ভালো লাগারই কথা।

দুটা বানান ভুল করেছে লক্ষ করেছেন? খোঁজ আর মুখস্থ। মুখস্থ দীর্ঘ উ-কার দিয়ে লিখেছে। কাছে থাকি না তো, কাছে থাকলে যত্ন করে পড়াতাম। সন্ধ্যাবেলা নিজের ছেলেমেয়েদের পড়তে বসানোর আনন্দের কি কোনো তুলনা আছে? তুলনা নেইরে ভাই। সবই আমার কপাল।

জহুরুল সাহেবর চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। তিনি শার্টের হাতায় চোখের পানি মুছছেন। যতই মোছেন ততই তার চোখে পানি আসছে।

জহুরুল সাহেব।

জি আব্দুল্লাহ ভাই।

আগামীকাল পাঁচটার সময় আপনার ইয়াকুব সাহেবের কাছে যাবার কথা না?

জি।

আমি ঠিক চারটা চল্লিশ মিনিটে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। আমিও যাব আপনার সঙ্গে। আপনার বন্ধু আবার আমাকে দেখে রাগ টাগ করবে না তো?

জি না। রাগ করবে কেন? রাগ করার কী আছে। সে যেমন আমার বন্ধু, আপনিও তো আমারই বন্ধু। আপনি সঙ্গে থাকলে বরং আমার ভালো লাগবে। চাকরির সংবাদ একসঙ্গে পাব। দুঃখ ভাগাভাগি করতে ভালো লাগে না ভাই সাহেব, কিন্তু আনন্দ ভাগাভাগি করতে ভালো লাগে। তখন আনন্দ বাড়ে।

ঠিক বলেছেন। আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? দুপুরে কিছু খেয়েছেন?

দুপুরে কিছু খাব না।

কেন?

জহুরুল সাহেব উত্তর দিলেন না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন,

আব্দুল্লাহ ভাই, আজকে সব খারাপের মধ্যেও একটা ভালো ঘটনা ঘটেছে আলহামদুলিল্লাহ।

কী ঘটল?

ফার্মগেটে গিয়েছি, হঠাৎ দেখি রাহমান। আব্দুর রাহমান।

চশমার ডাঁট সুতো দিয়ে বেঁধে সাহায্য চাইছে?

না ভাই। চশমার ডাঁট তো দেখলাম ঠিক আছে। মাথায় টুপিও পরেছে। রাস্তায় বসে বসে এখন মানুষের ডায়াবেটিস টেস্ট করে দিচ্ছে। প্রতি টেস্ট পঞ্চাশ টাকা। প্রচুর মানুষ টেস্ট করাচ্ছে। খুব ভালো ব্যবসা হচ্ছে মনে হলো। আমি সামনে যেতেই প্রশস্ত হাসি দিয়ে পাশে বসাল। আমার ডায়বেটিস ফ্রিতে মেপে দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করল।

আপনি টেস্ট করেননি?

না আব্দুল্লাহ ভাই। শুধু শুধু বন্ধুর ব্যবসার ক্ষতি করে লাভ কী। আমি তো ভালোই আছি।

তা ঠিক।

আব্দুর রাহমান মানুষ খারাপ না আব্দুল্লাহ ভাই। আমি যখন উঠে আসছি হঠাৎ আমার হাতটা ধরে আমার হাতে এক শ টাকা গুঁজে দিলো। আমি তো লজ্জায় আধমরা। সে আমার অবস্থা বুঝে বলল, ধার দিলাম পরে শোধ দিয়ে দিস।

আব্দুল্লাহ ভাই আব্দুর রাহমানের এই অবস্থা দেখে আমার যে কী আনন্দ লাগছিল তখন। আনন্দে চোখ দিয়ে পানি চলে এসেছে। আমার এই সমস্যা— একটু হলেই চোখ ভিজে যায়।

জহুরুল সাহেবের চোখ এখনো ভিজে আছে, সে শার্টের হাতা দিয়ে আবারও চোখ মুছতে শুরু করেছে।

আমি বললাম,

আপনি তাহলে দুপুরে কিছু খাবেন না?

জি না। দুটা সিঙ্গারা খেয়েছিলাম, পেটে গ্যাস হয়ে আছে। একটা কথা আব্দুল্লাহ ভাই।

বলুন।

আব্দুর রাহমান আপনাকে সালাম জানিয়েছে। খাস করে তার জন্যে দুয়া করতে বলেছে। আমি বুঝলাম না সে আপনাকে চিনল কী করে?

আমি ম্যানতা মার্কা বিখ্যাত হাসিটা দিলাম। এই হাসি এমন একটি অস্ত্র যা মানুষের দিকে তাক করলে মানুষ আর প্রশ্ন করতে পারে না। তারপর বললাম,

জহুরুল সাহেব আমি উঠি। আগামীকাল চাকরির খবরটা নিয়ে আমরা এক কাজ করব—সরাসরি আপনার দেশের বাড়িতে চলে যাব।

সত্যি যাবেন আব্দুল্লাহ ভাই?

যাব ইনশা-আল্লাহ।

আপনার ভাবির শরীরটা খারাপ। আপনাকে যে চারটা ভালো-মন্দ রেঁধে খাওয়াব সে উপায় নেই।

শরীর আল্লাহর ইচ্ছায় ঠিক হবে, এরপর ভালো-মন্দ রেঁধে খাওয়াবে, তারপরই আসব ইনশা-আল্লাহ। ভাবি সবচেয়ে ভালো রাঁধে কোন জিনিসটা বলুন তো?

গরুর গোশতের একটা রান্না সে জানে। অপূর্ব। মেথিবাটা দিয়ে রাঁধে। পুরো এক দিন নানা রকম মসলা দিয়ে গোশত মেখে ঠান্ডা জায়গায় রাখে। তারপর সেই গোশতকে চুলার ওপর সারাদিন ধরে জ্বাল দেয়। আলাদা কোনো পানি ব্যবহার করা হয় না। গরুর গোশত যে পানি ছাড়বে তা-ই দিয়ে রান্না হবে। কী যে অপূর্ব স্বাদ ভাই সাহেব!

ওই মেথির রান্নাটা ভাবিকে দিয়ে রাঁধতে হবে ইনশা-আল্লাহ।

অবশ্যই অবশ্যই। লইট্টা মাছ যদি পাওয়া যায় তাহলে আপনাকে এমন এক জিনিস খাওয়াবো— এই জীবনে ভুলবেন না। মাছটাকে ভালো করে বেটে ডুবু তেলে বেসন দিয়ে ভাজতে হবে। হালকা মরিচ আর লবণ ছাড়া কোনো মসলা না, কিছু না। দুটা কাঁচামরিচ, এক কোয়া রসুন, একটু পেঁয়াজ। এই দেখুন, বলতে বলতে জিবে পানি এসে গেল।

জিবে পানি যখন এসে গেছে চলুন খেয়ে আসি।

জি আচ্ছা চলুন। আপনি দেশে যাবেন ভাবতেই এত ভালো লাগছে।

মেস থেকে বের হবার মুখে ম্যানেজার নবাব জমির আলী বললেন, স্যার আপনি মেসে ছিলেন না, আপনার কাছে ওই ছেলেটা দুবার এসেছিল।

ইরান?

জি ইরান। ওনার বাসায় যেতে বলেছে। খুব নাকি দরকার।

জানি। আমার সাথে ওই ছেলের দেখা হয়েছে। নবাব সাহেব, আপনি বিচলিত হচ্ছেন কেন, শান্ত হন।

জি স্যার।

নবাব জমির আলী পিরিচে চা খাচ্ছিলেন, আবারও সেই চা তার পুরো গায়ে ছড়িয়ে ফেললেন। এই মানুষটা আমাকে এত ভয় পায় কেন কে জানে।

রাতের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা এবং ভূতের আতঙ্কগুলোকে ভোরবেলা উঠেই একটা হট শাওয়ার নিয়ে রাহেলা খালা দূর করে দেন। প্রতিবারের মতো এবারও গোসলের পর তিনি হিজাবটা মাথায় দিলেন। খানিকটা সাজগোজ করে আমার ঘরে এসে বললেন, কিরে আব্দুল্লাহ, জেগে আছিস? গুড মর্নিং।

আমি বললাম, আসসালামু আলাইকুম খালা।

চা দিতে বলেছি, হাত-মুখ ধুয়ে আয়।

তোমাকে তো হিজাবে ভালোই লাগে খালা। বোরখা পড়া শুরু করে দেবে নাকি!

কী বলছিস এসব। এখন সামান্য একটু সাজগোজ করছি। দুদিন পরে তো মরেই যাব। কবরে গিয়ে তো আর এইভাবে সাজগোজ করতে পারব না। কবরে তোরা তো আর ক্রিম, লিপস্টিক, ফেইস পাউডার কিনে দিয়ে আসবি না।

এটা খালা তুমি একটা খাঁটি কথা বলেছ। কবরে ক্রিম-লিপস্টিক দেয়ার সুযোগ নেই।

বয়সকালে সাজতে পারিনি। এমন এক লোকের হাতে পড়েছিলাম, সাজা না-সাজা যার কাছে সমান কথা। তাকে একবার খুব করে বলেছিলাম আমার জন্যে একটা ভালো ক্রিম আনতে—সেও বলল সে অবশ্যই খুব ভালো একটা ক্রিম নিয়ে আসবে। কিন্তু বাসায় নিয়ে এল দেশি তিব্বত স্নো। এনে সে কী খুশি। তার খুশি দেখে মনে হয়েছে পৃথিবীর সব থেকে দামি ক্রিম আমাকে এনে দিয়েছে। এরপর আবার তার আফসোস—অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে ক্রিমে!

থাক। আর দুঃখ কোরো না। তুমি তো এখন এগুলো সব পুশিয়ে নিচ্ছ।

তা নিচ্ছি। আয় চা খাবি। আজ ইংলিশ ব্রেকফাস্ট।

আলহামদুলিল্লাহ। ভালো তো...

চায়ের টেবিলে রাহেলা খালাকে বললাম, খালা অদ্য শেষ সকাল।

খালা বললেন, তার মানে কী?

তার মানে হচ্ছে, নাশতা খেয়েই আমি ফুটছি।

ফুটছি মানে কী?

ফুটছি মানে বিদায় হচ্ছি। এক পা দুপা করে পগারপার।

আশ্চর্য কথা, চলে যেতে হবে কেন? এখানে কি তোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

কোনোই অসুবিধা হচ্ছে না। বরং সুবিধা হচ্ছে। শুয়েবসে কাটাচ্ছি। আরাম করে খাচ্ছি। আমার ভুঁড়ি গজিয়ে গেছে। আর কদিন থাকলে মেদভুঁড়ি কী করি ওয়ালাদের খুঁজে বের করতে হবে।

ঠাট্টা করবি না আব্দুল্লাহ। খবরদার ঠাট্টা না।

আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না খালা, চা খেয়েই আমি ফুটব।

খালা বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, আমার এই ভয়ংকর দুরবস্থা দেখেও কি তোর দয়া হচ্ছে না? রাতে এক মুহূর্ত ঘুমোতে পারি না। ওই বদমায়েশ লোকটার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে গাড়ির সামনে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করে। আর তুই আমাকে এই অবস্থায় রেখে চলে যাবি?

খালু সাহেব কি কালও এসেছিল?

হু।

খালা গতকাল খালু সাহেবকে আমি স্বপ্নে দেখেছি।

কী বলিস! সত্যি?

হু।

হু-হ্যাঁ করিস না। ঠিকমতো বল, তুই দেখেছিস?

হু।

আবার হু। আরেকবার হু বললে কেতলির সব চা তোর মাথায় ঢেলে দেবো। কী দেখেছিস ঠিকমতো বল।

দেখলাম খালু সাহেব আমার খাটের সাইডে বসে আছে।

দেখে ভয় পেয়েছিলি?

ভয় পাব কেন? জীবিত অবস্থায় ওনার সঙ্গে আমার ভালো খাতির ছিল। একবার হেঁটে হেঁটে সদরঘাটের দিকে যাচ্ছি। তিনি তার প্রাইভেট রিকশায় যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে রিকশা থামিয়ে তুলে নিলেন। পথে এক জায়গায় তকমার শরবত বিক্রি হচ্ছিল। রিকশা থামিয়ে আমরা একসাথে তকমার শরবত খেলাম। কেঁচোর মতো তকমাগুলো দুজনে সেদিন দারুণভাবে চুষে চুষে খেয়েছি। এরপর আরেকটু এগিয়ে দেখি লেবুর শরবত বিক্রি করছে। রিকশা থামিয়ে দুজনে লেবুর শরবত গলায় চালান করে দিলাম। তারপর খালু সাহেব আইসক্রিম কিনলেন। খেতে খেতে আমরা তিন জন যাচ্ছিলাম।

তোরা তো দুজন ছিলি। তিন জন হলো কীভাবে?

রিকশাওয়ালাও খাচ্ছিল। তিন জন মিলে রীতিমতো এক উৎসব হয়েছিল সেদিন। বুঝলে খালা? তখনই বুঝলাম উনি একজন অসাধারণ মানুষ। ভালো মানুষ।

তুই এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যাচ্ছিস। আসল কথা বল। খাটের নিচে বসেছিল?

খাটের নিচে না, খাটের সাইডে।

তারপর?

আমি বললাম, খালু সাহেব কেমন আছেন?

সে কী বলল?

কিছু বললেন না। মনে হলো লজ্জা পেলেন। তখন আমি বেশ রাগ রাগ ভাব নিয়ে বললাম, আপনার মতো একজন ভদ্রলোক মেয়েছেলেকে ভয় দেখাচ্ছেন—এটা কি ঠিক হচ্ছে? ছি, ছি।

তুই কি সত্যি এসব দেখেছিস?

হ্যাঁ দেখেছি।

তারপর কী হলো?

মনে হলো উনি আমার কথায় আবারও খুব লজ্জা পেলেন। মাথা নিচু করে ফেললেন। আমার তখন মনটা একটু খারাপ হলো। আমি বললাম, এসব করছেন কেন?

সে কী বলল?

কথাবার্তা তার খুব পরিষ্কার না। মনে হলো তোমার ওপর তিনি রেগে আছেন। আমার মনে হয়, তুমি যে তাকে দেখছ এটা তোমার জন্যে একটা শিক্ষা হতে পারে আল্লাহর তরফ থেকে।

রাহেলা খালা ফস করে বললেন, শিক্ষা? কিসের শিক্ষা? আমি কী করেছি যে, আমাকে শিক্ষা দেবে? সারা জীবন যন্ত্রণা দিয়েছে। মরার পরও যন্ত্রণা দিচ্ছে। লোকটা ছিল হাড় বদমাইশ।

স্বপ্নে আমিও খালু সাহেবকে এ রকমই কিছু একটা বললাম, তবে বদমাইশটা মনে হয় বললাম না। তখন খালু সাহেবের মুখ থেকে একটা শব্দ খুব স্পষ্ট শুনলাম 'বিষ'। ভাবভঙ্গি দেখে যা বুঝলাম তাতে মনে হলো তার মৃত্যুতে তোমার কোনো একটা ইনভল্‌ভমেন্ট আছে। খালা, তুমি কি খালুকে বিষ-টিষ খাইয়েছিলে?

এত বড় মিথ্যা কথা আমার নামে? এত বড় সাহস? ব্যথায় তখন ওর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমার মাথার নেই ঠিক। দৌড়ে ওষুধ নিয়ে এসে খাওয়ালাম...

খালা যেটা খাওয়ানোর কথা সেটা না খাইয়ে ভুলটা খাইয়েছ। পিঠে মালিশের ওষুধ দু-চামচ খাইয়ে দিয়েছ, তাই না?

ইচ্ছে করে তো খাওয়াইনি, ভয়ে আমার মাথা ছিল এলোমেলো।

আমিও তা-ই ভেবেছি—এটা ছিল অনিচ্ছাকৃত একটা ভুল।

স্বপ্নে আমি খালু সাহেবকে বললাম, আপনি বিষের কথা বলছেন কেন? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, রাহেলা খালা ইচ্ছাকৃতভাবে বিষ খাইয়েছে আপনাকে? রাহেলা খালা মানুষ খুন করার মতো মহিলা না। অতি দয়ার্দ্র মহিলা।

তুই এটা বলেছিস?

হ্যাঁ বলেছি।

এটা শুনে সে কী বলল?

খিক খিক করে অনেকক্ষণ হাসল। তারপর আমি বললাম, এখন আপনার প্রতি তো খালার গভীর ভালোবাসা। আপনাকে ভালোবেসে খালা 'গগন আলী মিয়া ইন্সটিটিউট অব মডার্ন আর্ট' করতে চাচ্ছেন।

এই কথা শোনার পর তোর খালু কী বলল?

শুনে তোমাকে লানত দিয়েছে খালা।

রাহেলা খালা এখন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি আগের মতো নেই; তার চোখ লাল হয়ে আছে। ভয়ংকর চাহনি।

আমি শান্ত গলায় বললাম, খালা যা হবার হয়ে গেছে, এখন তোমার বাঁচার একটা উপায় আছে।

কী সেটা?

সেটা হলো তুমি আবার তোমার রবের দিকে ফিরে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবে। ঠিকমতো নামায পড়বে, পর্দা করবে। তোমার যে সহায়-সম্পদ আছে তা দান করে দেবে মাসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা নির্মাণের জন্যে। এবং তার যত গরিব আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের সবাইকে সাহায্য করবে। আর আল্লাহর কাছে তোমার গুনাহর জন্যে ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ হয়তো তোমাকে ক্ষমা করেও দিতে পারেন।



আব্দুল্লাহ!

জি খালা।

তুই ভীষণ বুদ্ধিমান। তুই আসলে স্বপ্ন টপ্ন কিছুই দেখিসনি। কারও সঙ্গেই তোর কথা হয়নি। পুরোটা আমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিস। তুই ধারণার ওপর অন্ধকারে ঢিল ছুড়েছিলি—লেগে গেছে। ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। তুই একটা ভণ্ড। আর তোর খালু মতো আমিও বোকা। কথা দিয়ে তুই আমাকে প্যাঁচে ফেলেছিস। তোর ধারণা তোর কথা শুনে আমি ভয় পেয়ে যাব। আর তার কোটি কোটি টাকা আমি দান-খয়রাত করে নষ্ট করব? আমি এই বোকামি কোনো দিনও করব না। রাতে ভূত হয়ে আমাকে ভয় দেখিয়ে মজা পায় সে। মজা পাক। তাতে কী হয়েছে? দেখাক ভয় যত তার ইচ্ছা, বদমাইশ এর বদমাইশ।

আমি মিথ্যা বলছি না খালা। আমি কিন্তু সত্যি দেখেছি।

বেশি চালাকি করতে যাস না আব্দুল্লাহ। তোর চালাকির আমি পরোয়া করি না। খবরদার, তোকে যেন আর কোনোদিন এই বাড়ির আশেপাশে না দেখি।

আর দেখবে না খালা। এই যে আমি ফুটব, জন্মের মতোই ফুটব। খালা শোনো, আমি যে স্বপ্নের কথা তোমাকে বললাম তা কিন্তু একবিন্দুও মিথ্যে না। পুরোটাই আমি দেখেছি।

চুপ থাক বেয়াদব। একদম চুপ।

রাহেলা খালা ভয়ানক হইচই শুরু করে দিলেন। বাবুর্চি, দারোয়ান, মালি সবাই ছুটে এল। রাহেলা খালা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এই চোরটাকে লাথি মেরে বের করে দাও।

রাহেলা খালার কর্মচারীরা ম্যাডামের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। শুধু লাথিটা দিলো না। কিছুদিন একসাথে দীন শিক্ষা করেছি তো। এর একটা তাসির তো আছেই। আমাকে গেটের বাইরে বের করে দিয়ে কিছুক্ষণ পর দুই বাবুর্চি আর মালি বাইরে এসে লাফ দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। আমি রাস্তায় চারদিকে তাকাচ্ছি। মানুষজন জড়ো হয়ে যাচ্ছে। কী মুশকিল!

কেয়ামতের দিন যে সাত ধরনের ব্যক্তিদের আল্লাহর আরশের নিচে ছায়ায় স্থান

দেয়া হবে, এদের মধ্যে তারাও থাকবে—যারা আল্লাহর জন্যেই পরস্পরের কাছে আসে আবার আল্লাহর জন্যেই দূরে সরে যায়। আল্লাহর জন্যে একজন আরেকজনকে ভালোবাসার ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। এই ভালোবাসা হয় নিঃস্বার্থ। পৃথিবীতে কি এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর কোথাও আছে? কোথাও নেই।

ঝিনুক-স্যুপ বাবুর্চির চোখ-নাক দিয়ে পানি বের হচ্ছে। তার নাকের পানিটা আমার জোব্বায় লেগে যাবে নিশ্চিত। অন্যদিন হলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতাম। আজ ধাক্কা দিতে মন চাচ্ছে না। লাগুক নাকের পানি। নাকের পানি দিয়ে জোব্বা ভিজে যাক।

খালার বাড়িতে আমার রেক্সিনের একটা ব্যাগ রয়ে গেল। ব্যাগের ভেতরে আমার ইহজাগতিক যাবতীয় সম্পদ। দুটা জোব্বা, একটা ভালো আতর। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আতর ভালোবাসতেন। তাই আমিও আতর ভালোবাসি। এই জন্যেই এই আতরটা আইশার বাবা আমাকে দুবাই থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। আমি হতদরিদ্র মানুষ হলেও বুকে হাত দিয়ে একটা কথা বলতে পারি—ঢাকা শহরে এমন দামি আতর আর কারোর কাছেই নেই।

আজকের দিনটা কেমন যাবে আল্লাহই ভালো জানেন। গালি খেয়ে দিনের শুরু। শেষটা কেমন হবে? যেমনই হোক। নিশ্চয়ই আল্লাহর ফয়সালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়াই উত্তম।

আইশার বাবার সাথে আজ সকালের মধ্যেই আমার দেখা করা দরকার। আল্লাহর ইচ্ছায় একমাত্র এই ভদ্রলোকই পারে এক দিনের নোটিশে জহুরুল সাহেবের জন্যে চাকরির একটা ব্যবস্থা করতে। টেলিফোনে আইশার বাবার সাথে কথা বলব, না সরাসরি উপস্থিত হব—তা বুঝতে পারছি না। অভিদের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার। অভি এমন কী করেছে যে, ইরামকে বার বার আমার খোঁজে যেতে হচ্ছে? আইশার বাবাকে অভিদের বাসা থেকেও টেলিফোন করা যায়।

অভিদের বাসার দরজার কলিং বেলে হাত রাখতেই দরজা খুলে দিলো ইরাম। মনে হলো আমার কলিং বেলের অপেক্ষায় দরজার পাশেই বসা ছিল সে। তার এই ত্বরিত গতিতে দরজা খোলার ভেঙ্কিতে সামান্যতম বিস্ময় প্রকাশ না করে আমি অসম্ভব ভদ্র গলায় বললাম, কেমন আছেন?

ইরাম কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। আমার ওপর তার খেদটা দেখে মনে হচ্ছে এখনই সে অগ্নিশর্মা হয়ে আমার ওপর ফেটে পড়বে। আমাকে যে লাঠি দিয়ে মারছে

না সেটাই আমার ভাগ্য।

অভি আছে নাকি?

আছে।

ফুপা-ফুপু আছেন?

সবাই আছেন। আপনি বসুন।

ইরাম গম্ভীর মুখে ভেতরে চলে গেল।

এমনভাবে গেল যেন আমাকে বসিয়ে সে ফুপার দোনালা বন্দুকটা আনতে গেছে। ফুপা অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। প্যান্ট পরেছেন, বেল্ট লাগানো হয়নি। সেই অবস্থাতেই চলে এলেন। আগুন আগুন চোখে তাকালেন। স্বামীর পেছনে পেছনে স্ত্রী, আমার ফুপুও চলে এসেছেন। তার চোখেও ডাবল আগুন।

আমি আগুন উপেক্ষা করে হাসিমুখে বললাম, তারপর কী খবর আপনাদের, কেমন চলছে? সব ভালো তো?

ফুপা ক্রুদ্ধ হুংকার ছাড়লেন। হুংকার শুনেই মনে হচ্ছে খবর ভালো না।

অভির গলায় আবার কাঁটা-কোটা বিঁধেছে নাকি?

ফুপা গর্জন করে বললে, আমার সাথে ইয়ার্কি করছিস? আবার দাঁত বের করে ইয়ার্কি? তোর সাহস তো কম না।

আমার অপরাধ কী বুঝতে পারছি না। তবে গুরুতর কোনো অপরাধ যে করে ফেলেছি তা বোঝা যাচ্ছে। ইরামও এসেছে। ইরামের চোখে চশমা। আজব ব্যাপার হলো আগে কখনো ইরামের চোখে চশমা দেখিনি। আজ প্রথম দেখছি।

ফুপু বললেন, তোকে যে এতবার খবর দেয়া হয়েছে আসার জন্যে, পাত্তা দিসনি কেন।

পাত্তা দেবো না কেন? পাত্তা দিয়েছি।

বেয়াদব মুখের ওপর কথা বলে। তোকে কি উড়োজাহাজ পাঠিয়ে আনাতে হবে?

এলাম তো ফুপু।

ফুপু হুংকার দিলেন।

এসে উদ্ধার করে ফেলেছিস।

ব্যাপারটা কী ফুপু, খোলাসা করে বলুন।

কেউ কিছু বলছে না। ভাবটা এ রকম—আমি বলব না, অন্য কেউ বলুক। আমি ইরামের দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বললাম, ইরাম চা খাব।

ইরাম এমন ভাব করল যেন অত্যন্ত অপমানসূচক কোনো কথা বলা হয়েছে তাকে।

আমি বললাম, তুমি যদি চা বানাতে না পারো, তাহলে লুতফার মাকে বলো। ভালো কথা—লুতফা মেয়েটা কোথায়? তাকে ডাকো একটু দেখি।

এবারও জবাব নেই। ফুপা পেন্টের বেল্ট লাগাচ্ছেন বলে অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে পারছেন না। তাকে বেল্টের বোতামের দিকে লক্ষ রাখতে হচ্ছে। তবে ফুপু তার দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর কার্য পূরণ করে দিচ্ছেন। তার চোখে ডাবল আগুন। কথা বলল ইরাম। কাঁটা কাঁটা ধরনের কথা। তার কাছ থেকেই জানা গেল—লুতফার মা লুতফাকে পেয়ে কিছুদিন পরই নিয়ত করেছে যে, সে বাকি জীবন সঠিকভাবে ইসলাম পালন করবে, খাস পর্দা করবে। বাসাবাড়িতে আর কাজ করবে না। মেয়েকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে যাবে। সেখানে মেয়েকে কুরআন শিক্ষা দেবে। কুরআনের হাফেজ বানাবে। বাকি জীবন দীনের খেদমতেই কাটিয়ে দেবে। কাজেই বাড়িতে এই মুহূর্তে কোনো কাজের মেয়ে নেই। আগের মতো চাইলেই চা পাওয়া যাবে না।

অভির প্রসঙ্গে যা জানা গেল তা লুতফার মায়ের ঘটনার থেকেও ভয়াবহ। অভি গত দশ দিন হলো ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না। দরজা বন্ধ করে শুধু কুরআন পড়ছে আর টানা রোজা রাখছে।

আমি মধুর ভঙ্গিতে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, রোজা রাখা তো গুরুতর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। আপনারা এত আপসেট কেন?

ফুপা বললেন, মুগুর দিয়ে এমন এক বাড়ি দেবো যে, সবক'টা দাঁত খুলে চলে আসবে। রোজা রাখা শেখায়, সাহস কত বড়! যা, রোজা কীভাবে রাখছে নিজের চোখে গিয়ে দেখে আয়।

দিনে টানা রোজা রাখছে আর রাতে পুরোটা রাত দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুত পড়ছে। অন্য কাজের মধ্যে শুধু কুরআন পড়ছে। দশ দিন এভাবেই পার করে দিয়েছে।

সে কী?

আবার বলে সে কী? তুই নাকি বলেছিস, বিয়ের ইচ্ছে জাগলে বিয়ে না করতে পারলে রোজা রাখতে হয়। আর তোর মতো নেক বান্দা হতে হলে তাহাজ্জুত পড়তে হয়? নেক বান্দা হওয়া কাকে বলে তোকে আমি শেখাব। বন্দুক দিয়ে আজ তোকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব। শহীদ বানায়ে দেবো। পীরসাব এসেছে, ইসলাম শেখায়।

ফুপু বলল, তুমি এত হইচই কোরো না। তোমার প্রেসারের সমস্যা আছে। তুমি অফিসে চলে যাও। যা বলার আমি বলছি।

অফিস জাহান্নামে যাক। আমি আব্দুল্লাহকে আজ সত্যি সত্যি গুলি করে মেরে তারপর অফিসে যাব। পীরসাবগিরি বের করে দেবো।

ইরাম বলল হইচই করে তো লাভ কিছু হবে না। ব্যাপারটার ভালো মীমাংসা হওয়া দরকার। উনি অভিকে বুঝিয়ে বলবেন যেন সে এসব না করে। তারপর তিনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। আর কখনো এ বাড়িতে আসবেন না এবং অভির সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ রাখবেন না।

ফুপা তীব্র গলায় বললেন, যোগাযোগ রাখবে কীভাবে? এই কুলাঙ্গারকে আমি দেশছাড়া করব! পুলিশে দেবো। টেররিস্ট কোথাকার।

পরিস্থিতি ঠান্ডা হতে কিছু সময় লাগল। ঘড়ি ধরে বলতে গেলে আধ ঘণ্টার মতো লাগল। এরই মধ্যে ইরাম চা নিয়ে এল। ফুপার অফিসের গাড়ি চলে এলে তিনি আপাতত আমাকে গুলি করা থেকে বিরত থেকে অফিসে চলে গেলেন। ফুপু ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগলেন। ফোঁসফোঁসানির মাঝখানে যা বললেন তা হলো,

এত বড় দামড়া ছেলে কিছু না খেয়ে ঘরের কোনায় বসে আছে। জিজ্ঞেস করলেই বিয়ের কথা বলে। নিজেকে সামলাতে নাকি রোজা রাখছে। ছি ছি। ভাগ্যিস বাইরের মানুষজন অভির এই কথা শোনে নাই। কী লজ্জার কথা!

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দিলেই তো পারেন।

ফুপু ফোঁসফোঁসানির মাঝখানেই নাগিন দৃষ্টিতে আবার আমার দিকে তাকালেন। মনে হচ্ছে নাগিন ফণা তুলেছে, এখনই আমায় ছোবল মারবে।

ইরাম আমার দিকে তাকিয়ে মোটামুটি শান্ত ভঙ্গিতেই বলল, আপনি চা খেয়ে দয়া করে অভির কাছে যান। তাকে বুঝিয়ে বলুন। সে বাস্তব এবং কল্পনা গুলিয়ে ফেলেছে।

আমি চায়ের কাপ হাতে অভির ঘরে গিয়ে টোকা দিলাম। অভি আনন্দিত গলায় বলল, আব্দুল্লাহ ভাই?

হু।

আমি টোকা শুনেই টের পেয়েছি। তুমি ছাড়া এ রকম করে কেউ টোকা দেয় না।

তুই রোজা রাখছিস নাকি?

হু।

দরজা খোল দেখি।

অভি দরজা খুলল। ছেলেটা শুকিয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে বেচারাকে দেখে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে।

তোমাকে দেখে এত আনন্দ হচ্ছে আব্দুল্লাহ ভাই, মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলি।

তুই নাকি সারা দিন রোজা রাখিস আর সারা রাত তাহাজ্জুতের নামায পড়িস?

তুমি একবার বলেছিলে না—নিজেকে সামলে রাখতে হলে রোজা রাখতে হবে। আর আল্লাহর প্রিয় হতে হলে, আল্লাহর নৈকট্য পেতে হলে তাহাজ্জুতের নামায পড়তে হবে।

বলেছিলাম নাকি?

হ্যাঁ বলেছিলে।

হু। কিন্তু এর সাথে তোকে একটা কথা বলা হয়নি।

সেটা কী আব্দুল্লাহ ভাই?

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি হাদিস।

কোন হাদিসটা?

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহীহ বুখারি আছে তোর কাছে?

অবশ্যই আছে। কোন অধ্যায়, বলো বের করে নিচ্ছি।

তেইশ নম্বর অধ্যায়। রোজার অধ্যায়টা খুলে ১৮৫১ নম্বর হাদিসটা দেখ।

অভি উৎসাহ নিয়ে ১৮৫১ নম্বর হাদিস খুঁজছে। তার চোখ চকচক করছে। অল্প পরেই তার উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়েছে। অভির ভ্রু হঠাৎ কুঁচকে গেছে।

কি; পেয়েছিস?

হু।

জোরে জোরে পড়, যাতে পাশের বাড়ির মানুষও শুনতে পায়।

অভি পড়া শুরু করল,

"আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি প্রতিদিন রোজা পালন কর এবং সারারাত নামায আদায় করে থাক। আমি বললাম, ঠিক শুনেছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, এরূপ করবে না বরং মাঝে মাঝে রোজা পালন কর আবার রোজা ছেড়েও দাও। রাতে (কিছু অংশ) সালাত আদায় কর আবার (কিছু অংশ) ঘুমাও। কেননা তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার চোখের হক্ব রয়েছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক্ব আছে, তোমার মেহমানের হক্ব আছে। তোমার জন্যে যথেষ্ট যে, তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা পালন করবে। কেননা নেক আমলের পরিবর্তে তোমার জন্যে রয়েছে দশগুণ নেকী। এভাবে সারা বছরের রোজা হয়ে যায়।

আমি বললাম, আমি এর চেয়েও কঠোর আমল করতে সক্ষম। তখন আমাকে আরও কঠিন আমলের অনুমতি দেয়া হলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আরো বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তবে আল্লাহর নাবী দাউদ আলাইহিস সালাম এর রোজা পালন কর, এর থেকে বেশী করতে যেও না। আমি জিজ্ঞেস

করলাম, আল্লাহর নাবী দাউদ (আ)-এর রোজা কেমন? তিনি বললেন, অর্ধেক বছর। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বৃদ্ধ বয়সে বলতেন, আহা! আমি যদি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত রুখসত (সহজতর বিধান) কবুল করে নিতাম!"

কী, বুঝলি?

অভি ভ্রু উঁচিয়ে বলল, জোর করে নিজের ওপর শক্ত আমাল চাপিয়ে নেয়া ঠিক হচ্ছে না ভাইয়া।

হু। ঠিক বলেছিস।

তাহলে এখন কী করব?

কী আর করবি, রোজা ভেঙে ফেল। আমার সাথে চারটে খেয়ে তারপর ইউনিভার্সিটিতে যা।

রোজা ভাঙলে গুনাহ হবে না?

ইনশা-আল্লাহ কোনো গুনাহ হবে না। নফল রোজা; আমি মেহমান, আমার হক্ব আছে তোর ওপর। একজন সাহাবিও ঠিক তোর মতো রোজা রেখেছিল, তাকেও আরেক সাহাবি রোজা ভাঙিয়েছিল। আজ তুই রোজা ভাঙলে সেই সাহাবিদের কাজটার পুনরাবৃত্তি করা হবে। তবে তোকে পরে রোজাটির কাজা আদায় করে নিতে হবে।

তাহলে রোজাটা ভেঙে ফেলি, কী বলো।

হ্যাঁ, রোজা ভেঙে তারপর ইউনিভার্সিটিতে যা।

ইউনিভার্সিটিতে যেতে বলছ?

অবশ্যই।

আমার ইউনিভার্সিটিতে যেতে ইচ্ছে করে না।

কী ইচ্ছে করে?

সারাক্ষণ ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকি, তোমার সঙ্গে পথে পথে হাঁটি, তোমার সঙ্গে একসাথে তাহাজ্জুতের নামায আদায় করি।

এই পৃথিবীতে আর কতক্ষণই-বা তুই আমার পাশে থাকতে পারবি। ভালো হয় যদি দুজনে জান্নাতে যেতে পারি। তাহলে অনন্তকাল একসাথে সময় কাটানো যাবে। একসাথে হয়ে এক এক সাহাবি, নবিদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া যাবে। কোয়ালিটি সময় কাটান যাবে। কী, নিশ্চয়ই তুই জান্নাত মিস করতে চাস না?

কখনোই না।

হু। ভেরি গুড। এখন যা, কিছু খেয়ে ইউনিভার্সিটিতে চলে যা।

অভি ঘরের টেবিলে রাখা গ্লাস নিয়ে ঢক ঢক করে পানি খেয়ে ফেলল। তারপর বলল, তোমার সাথে খাওয়ার ব্যাপারটা না থাকলে আজ বাসায় খেতাম না। রাস্তায় পাতিলের গায়ে লাল কাপড় প্যাঁচানো দোকানের তেহারি খেতাম, রাস্তার তেহারি দারুণ স্বাদ।

রাস্তার তেহারি খেতে ইচ্ছে করলে সেটাই খাবি। এসব ইচ্ছেগুলো ছোট, এগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। আমার সাথে খাওয়ার জন্যে ইরাম আছে।

ঠিক আছে ভাইয়া। তাহলে আমি যাচ্ছি। আব্দুল্লাহ ভাই তুমি কি আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে? জাস্ট ওয়ান?

তোর একটা না, এক লক্ষ রিকোয়েস্ট রাখব। বলে ফেল।

ইরাম ছেলেটাকে একটা শিক্ষা দেবে? কঠিন একটা শিক্ষা।

সে কী করেছে?

তোমাকে নিয়ে শুধু হাসাহাসি করে, রাগে আমার গা জ্বলে যায়।

সামান্য ব্যাপারে গা জ্বললে কেমন হবে?

আমার কাছে সামান্য না। কেউ তোমাকে কিছু বললে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ভাই, তুমি ইরামকে একটা শিক্ষা দাও। ওকে শিক্ষা দিতেই হবে।

কী শিক্ষা দেবো?

ওর জন্যে বদদোয়া করো যেন ও লাঞ্ছিত হয়।

তার চেয়ে বরং তুই-আমি মিলে আয় ওর জন্যে দোয়া করি, আল্লাহ যেন ওকেও হেদায়েত দিয়ে দেন। ঠিক আছে।

হু। ঠিক আছে। তবে ওকে নিয়ে আশা ক্ষীণ।

আল্লাহ্ চাইলে সব সম্ভবরে পাগলা। সব সম্ভব।

ফুপু এবং ইরামের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে অভি কাপড়-চোপড় পরে ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, বাইরে খেয়ে নেব।

ইরাম আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি যা করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া করে এ বাড়িতে আর আসবেন না।

আমি বললাম, জি আচ্ছা। শুধু একটা টেলিফোন করব। টেলিফোন করেই চলে যাব। আর জীবনেও এ বাড়ির পথ মাড়াব না।

ইরাম বলল, যদি সম্ভব হয় আপনি দয়া করে নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করবেন। আপনাকে আমি কোনো উপদেশ দিতে চাই না। অপাত্রে উপদেশ দেয়ার অভ্যাস আমার নেই। তারপরেও একটা কথা না বলে পারছি না। পকেট ছাড়া জোব্বা গায়ে দিয়ে রাস্তায় হাঁটলে আর রাত জেগে মাসজিদের বারান্দায় নামায পড়লেই প্রকৃতিকে বোঝা যায় না। প্রকৃতিকে জানার পথ হলো বিজ্ঞান। বুঝতে পারছেন।

হু।

পারলে ভালো। না পারলেও ক্ষতি নেই।

ফুপু বললেন, ওর সঙ্গে বেশি কথা বলিস না ইরাম। ওর সঙ্গে বেশি কথা বললে ও তোর মাথাটাও কচকচ করে খেয়ে ফেলবে; ও কোনো একটা জাদু জানে। এমনভাবে কথা বলে যাতে ইয়াং ছেলে-মেয়েদের মাথা নষ্ট হয়ে যায়; তুই ওকে টেলিফোনটা এনে দে, টেলিফোন করে বিদায় হোক। ইরাম টেলিফোনটা এনে দিলো।

হ্যালো চাচা, আমি আব্দুল্লাহ।

বুঝতে পারছি—আইশার বাবার শান্ত জবাব।

কেমন আছেন চাচা?

আমি কেমন আছি সেটা জানার জন্যে তুমি আমাকে টেলিফোন করোনি। তোমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। সেটা বলে ফেলো।

রাগ করছেন কেন?

রাগ করছি না। তোমার ওপর রাগ করা অর্থহীন। যে রাগ বোঝে না, তার ওপর রাগ করে লাভ কী?

রাগ হচ্ছে মানবচরিত্রের অন্ধকার বিষয়ের একটি, রাগ না বোঝাটা তো ভালো।

যে অন্ধকার বোঝে না, সে আলোও ধরতে পারে না।

চাচা আপনার লজিকের কাছে সারেন্ডার করছি।

কী জন্যে টেলিফোন করেছ বলো?

আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন চাচা? এমন একটা চাকরি যেন ভদ্রভাবে খেয়ে-পরে ঢাকা শহরে ছোটখাটো একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকা যায়। জোগাড় করে দিতে পারবেন?

তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ আর আমার সাধ্যে থাকা সত্ত্বেও আমি তা দিইনি এমন কি কখনো হয়েছে?

না, হয়নি।

এবারও হবে না ইনশা-আল্লাহ।

আজকের দিনের ভেতর চাকরিটা জোগাড় করে দিতে হবে।

খুব কঠিন আব্দুল্লাহ। এক দিনের মধ্যে জোগাড় করা।

আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে আর আপনি একটু চেষ্টা করলে আশা করি এটা আপনার জন্যে অসম্ভব না।

চাকরি কার জন্যে?

আমার এক বন্ধুর জন্যে। অতি প্রিয় একজনের জন্যে।

নাম বলো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে তার নাম টাইপ করতে হবে।

লেখেন, জহুরুল আলম। চাকরিটা কিন্তু আজকের মধ্যেই জোগাড় করতে হবে চাচা।

চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার কি তুমি এসে নিয়ে যাবে?

হ্যাঁ, আমি এসে নিয়ে যাব।

তুমি কোত্থেকে টেলিফোন করেছ? যদি বলতে, তোমার কোনো আপত্তি না থাকলে।

আমি অভিদের বাসা থেকে টেলিফোন করছি। এই নম্বর আপনার কাছে আছে। এই নম্বরে টেলিফোন করে আমাকে পাবেন না, তারা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। এই যে আপনার সাথে কথা বলার পর ফোন রেখে বের হলেই। এই বাসায় আর আমার প্রবেশের অনুমতি থাকবে না।

সবাই তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়?

হ্যাঁ, দেয়। ইসলাম নিয়ে কথা বললে শুধু ঘর কেন অনেক সময় নিজের শহর থেকেই বের করে দেয়া হয়। আমি তো ভালোই আছি এখনো শহর থেকে কেউ বের করে দিচ্ছে না। চাচা আমি টেলিফোন রাখছি।

হুট করে টেলিফোন রেখে দিলাম। ইরাম তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। ছেলেটা আমার কথা শুনেছে। এই কাজটা ঠিক না। এত ভালো একটা ছেলের এই বাজে অভ্যাসটা দেখে মনটা খারাপ হলো। আমি কিছু বললাম না। খাওয়া সেরে আমি ফুপুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম, ইরামের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ইরাম বলল, আপনাকে অনেক কঠিন কথা বলেছি, আপনি কিছু মনে করবেন না।

আমি বললাম, আমি কিছু মনে করিনি। আমি নানাভাবে আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করেছি। আপনিও কিছু মনে করবেন না।

আমার ক্ষীণ আশা ছিল, ছেলেটা হয়তো বাড়ির গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দেবে। সে এল না। আশ্চর্য! কঠিন এক ছেলে।

আমি এবং জহুরুল সাহেব ভদ্রলোকের মতো বসে আছি। আমাদের সামনে বসে আছেন ইয়াকুব আলী সাহেব। তার আর আমাদের মাঝখানে বিরাট এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলে কয়েকটি মুঠোফোন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যার মধ্যে আই ফোন আছে, স্যামসাং এর সবথেকে নতুন ফোনটি আছে, আরও কয়েকটা সেট রয়েছে—যার নামও আমার জানা নেই। এতগুলো সেট কী সে ব্যবহার করে নাকি শুধু দেখানোর জন্যে সাজিয়ে রাখে সেটাই এক রহস্য। টেবিলের ওপর দুটা আগের আমলের টেলিফোনও দেখা যাচ্ছে। একটা সাদা, একটা লাল। ইয়াকুব আলী সাহেব যেই চেয়ারটায় বসেছেন। সেটাকে রিভলভিং চেয়ার বলে। তিনি দারুণ ব্যস্ত। আমরা বসে থাকতে থাকতে তিনি তিন-চারটা টেলিফোন করলেন। প্রত্যেকটা ফোন তিনি করলেন ল্যান্ড ফোন ব্যবহার করে। মুঠোফোন দিয়ে কোনো ফোন করলেন না। তার টেলিফোন করার ধরনটাও বেশ মজার। টেলিফোনে কথা বলার সময় তার রাজ্যের অস্থিরতা। স্থির হয়ে একমুহূর্ত কথা বলতে পারেন না। যতবার টেলিফোনে কথা বলেছেন, রিভলভিং চেয়ারে পাক খেতে খেতে কথা বলেছেন। জহুরুল সাহেব অবশ্য এসব লক্ষ করছেন বলে মনে হলো না। তিনি খুব উসখুস করছেন। আমি চুপচাপ বসে ইয়াকুব আলী সাহেবের কর্মকাণ্ড দেখছি। ইয়াকুব আলী সাহেব এতই ব্যস্ত যে একমুহূর্তের জন্যে আমাদের দিকে ফিরে তাকানোর সময় পাচ্ছে না। তিনি কাজের এক ফাঁকে আমাদের দিকে একটু তাকাতেই জহুরুল সাহেব বললেন, ইয়াকুব, তোমার এই ব্যস্ততায় তোমাকে বিরক্ত করছি। দুঃখিত ভাই। আচ্ছা পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন আমার ফ্রেন্ড সুবোধ সাহেব, সবাই অবশ্য ওনাকে আব্দুল্লাহ বলে ডাকে। ওনাকে সাথে করে এনেছি।

ইয়াকুব আলী আমার দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হেসে বললেন, চা খাবেন?

বলেই ইন্টারকমে কাকে যেন খুব ধমকাতে শুরু করলেন।

আমরা ধমকাধমকির পর্ব শেষ হবার জন্যে শান্তভাবে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খানিক সময় বাদে ধমকপর্বের ইতি ঘটল। ইয়াকুব আলী আমাদের দিকে তাকালেন। এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন আমাদের সামনে চা নেই। তিনি বললেন একি, এখনো চা দেয়নি?

বলেই কর্কশ শব্দে বেল বাজাতে লাগলেন।

জহুরুল সাহেব বললেন, চা খাব না ইয়াকুব।

কেন খাবে না। অবশ্যই খেতে হবে। তুমি তোমার বন্ধু নিয়ে এসেছ। সে ফার্স্ট টাইম আমার অফিসে এসেছ, চা খাবে না মানে? তারপর বলো কী ব্যাপার?

জহুরুল সাহেব মনে হলো বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল।

সে নরম গলায় বলল, তুমি বলেছিলে আমার চাকরির একটা ব্যবস্থা করবে।

ইয়াকুব আলী গম্ভীর মুখে বলল,

বলেছিলাম নাকি?

বলেই হো হো করে কিছুক্ষণ হাসল। মনে হলো রসিকতা করে তিনি খুব মজা পেয়েছেন। ইয়াকুব হাসিমুখে বলল, বলেছি যখন তখন অবশ্যই কিছু একটা করব। স্কুলজীবনের বন্ধুর সামান্য উপকার করব না—তা তো হয় না। বায়োডাটা তো দিয়ে গিয়েছ?

হাঁ। দুবার দিয়েছি।

আমি দেখেছি জহুরুল। তুমি চিন্তা কোরো না। একটা কিছু হবে। তবে আপাতত কিছু করা যাচ্ছে না। নো ওপেনিং বুঝলে। যেসব চাকরি এখন এভেইলেবল আছে তোমাকে আবার সেগুলো দেয়া যাবে না। তুমি নিশ্চয়ই আমার অফিসে পিয়নের চাকরি করবে না। হে হে...

জহুরুল সাহেবের মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তার চোখ টলটল করছে। তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুমি আজকে আমাকে একটা চাকরি দেবে বলে নিশ্চিত করেছিলে

ইয়াকুব। আমার অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

ইয়াকুব মনে হলো দার্শনিক হয়ে গেছে। সে গভীর আধ্যাত্মিক ভাব ধরে বলল, অবস্থা তো শুধু তোমার একার ভয়াবহ না, পুরো বাঙালি জাতির অবস্থাই এখন ভয়াবহ। বাঙালি নিজের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে, চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। এর সাথে ব্যবসা করা ভুলে গেছে। ব্যবসা বলতে এই দেশে এখন আর কিছু নেই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান লসে রান করছে। বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না।

ইয়াকুব তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছিলে, আমাকে ওয়াদা করেছিলে।

ওয়াদা দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। আমি তো বলিনি আমি আমার ওয়াদা ভঙ্গ করব। তোমার জন্যে আমি ঠিকই একটা ব্যবস্থা করব। আমি কী করব তোমাকে বলি, আমি আমার এই বিজনেসটাকে কসমেটিক্স লাইনে এক্সপ্যান্ড করব। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি যে ওটা যখনই চালু হবে তখনই তোমাকে ওখানে একটা ম্যানেজারিয়াল পোস্ট দেবো।

সেটা কবে হবে ইয়াকুব?

হয়ে যাবে। তবে একটু সময় তো নেবেই। জমি কিনে ফেলেছি। ব্যাংক লোনের জন্যে অ্যাপ্লাইও করা হয়ে গেছে। বিদেশি কোনো ফার্মের সঙ্গে কোলাবরেশনে যাব। কাদের সাথে কোলাবরেশন করা যায় তা-ই চিন্তা করছি। কোলাবরেশন হয়ে গেলেই, ফ্যাক্টরি তৈরি হবে, তারপরই কাজ শুরু। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। এটা মনে রাখবে।

জহুরুল সাহেবে থ মেরে গেছেন। তার থ মেরে যাওয়া মুখ দেখে আমার নিজেরই বেশ মায়া লাগছে। আহা বেচারা। সে বোধ হয় জীবনে এত অবাক হয়নি কখনো। এসি বসানো ঠান্ডা ঘরে বসে দরদর করে ঘামছে।

আমাদের জন্যে চা চলে এসেছে। ইয়াকুব সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, সিগারেট খাবেন নাকি ভাই? আজকাল তো অনেক দাড়ি-জোব্বাওয়ালারাও সিগারেট খায়। চলবে নাকি একটা?

তিনি আমাদের দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি সিগারেট নিতে নিতে বললাম, কিছু মনে করবেন না ইয়াকুব সাহেব। একটা কথা বলুন তো, জহুরুল সাহেবকে চাকরিটার জন্যে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

ইয়াকুব সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে বলা তো কঠিন ব্যাপার, তবে তিন চার বছর তো লাগবেই। আরও বেশিও লাগতে পারে।

আমি সিগারেটটা বাম হাতে পিষে ছুড়ে ফেললাম ময়লার ঝুড়িতে। তারপর চায়ে খুব আয়েশ করে চুমুক দিয়ে হাসিমুখে বললাম—ভাই শুনুন, চাকরি আপনার মতো মানুষের পক্ষে দেয়া সম্ভব না, এই সরল এবং নির্ভেজাল কথাটা সরাসরি আপনার বন্ধুকে বলে দিচ্ছেন না কেন? বলতে অসুবিধা কী? চক্ষুলজ্জা হচ্ছে? আপনার মতো নির্লজ্জ মানুষের তো চক্ষুলজ্জার মতো কিছু থাকার কথা না।

ইয়াকুব আলী চশমার ফাঁক দিয়ে পিটপিট করে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। ঠান্ডা মাথায় আমাকে বোঝার চেষ্টা করছেন। দাড়ি-জোব্বাওয়ালা লোক সাধারণত অতিমাত্রায় বিনয়ী হয়। এভাবে সরাসরি অপ্রিয় কথা বলায় তিনি ভড়কে গেছেন। খুব সম্ভবত টেররিস্ট কি না তা-ই বোঝার চেষ্টা করছেন অথবা আমার ক্ষমতা যাচাই করার চেষ্টা করছেন।

জহুরুল সাহেব বললেন, আব্দুল্লাহ ভাই, চলুন যাই।

আমি বললাম, চাটা দারুণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, শেষ করে তারপর যাব।

ইয়াকুব আলী এখনো তাকিয়ে আছেন, তার হাত আইফোনের ওপর। জরুরিভিত্তিতে কাউকে ফোন করার মনস্থ করেছেন বলে মনে হয়। তার ভীত চোখ আমার মুখে আটকে আছে। আমি তার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আপনি কী আমাকে ভয় পাচ্ছেন? ভয় পেতে পারেন, অসুবিধা নেই। এখন যে সময় পড়েছে তাতে, দাড়ি-টুপিওয়ালা মানুষকে ভয় পাওয়াটা দোষের কিছু না। তবে আমি নিরীহ মানুষ। কিছু করতে চাইলেও আপনাকে এই মুহূর্তে কিছুই করতে পারব না। আমি যা করতে পারি তা হলো—আপনার মুখে একদলা থুতু ফেলতে পারি। এতে অবশ্য আপনার তেমন কিছু হবে বলে মনে হয় না। কারণ, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আপনার মুখে অদৃশ্য থুতু ফেলছে। আপনি মানুষের এই অদৃশ্য থুতু গায়ে মেখে অভ্যস্ত। কেউ আপনার গায়ে থুতু না ফেললেই বরং আপনি অবাক হবেন।

জহুরুল সাহেব হাত ধরে আমাকে টেনে তুলে ফেললেন। চাপা গলায় বললেন, আব্দুল্লাহ ভাই, পাগলামি করছেন কেন?

ইয়াকুব সাহেব তাকিয়ে আছেন। রাগে তার হাত কাঁপছে। সম্ভবত কী করবেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। আমি তার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললাম, ভাই আপনি আমাকে ভালো করে চিনে রাখুন। আমি সুব্রত। সুব্রত রায়হান। সবাই ডাকত সুবোধ। আর এখন আমি আব্দুল্লাহ।

জহুরুল সাহেব আমাকে টেনে ঘর থেকে বের করে ফেললেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে আমি বললাম, জহুরুল সাহেব আপনি মেসে চলে যান। আমি একটা কাজ সেরে মেসে আসছি। তারপর দুজন একসঙ্গে আপনার গ্রামের বাড়ি রওনা হয়ে যাব ইনশা-আল্লাহ।

আমার সঙ্গে তো টাকা-পয়সা কিছুই নেই ভাই।

একটা ব্যবস্থা হবেই ইনশা-আল্লাহ। আপনার কি মেসে ফিরে যাবার মতো বাস ভাড়া আছে?

জি না।

আমার কাছেও নেই। পকেট ছাড়া জোব্বাটা আজও পরে চলে এসেছি। আপনি হেঁটে হেঁটে চলে যান। চিটাগাং-এর রাতের ট্রেন কয়টায়?

সাড়ে দশটায়।

আমি তাহলে কাজ সেরে রাত ঠিক দশটার আগে মেসে অবশ্যই পৌঁছে যাব ইনশা-আল্লাহ।

জহুরুল সাহেব পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, কী ইচ্ছা করছে জানেন আব্দুল্লাহ ভাই? ইচ্ছা করছে একটা চলন্ত ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়ে যাই। পরক্ষণেই ভাবি, আল্লাহর জন্যেই তো চাকরিটা ছেড়েছি; তিনিই পরীক্ষা নিচ্ছেন।

আল্লাহ যাকে বেশি ভালোবাসেন তারই বেশি পরীক্ষা নেন।

বুঝি আব্দুল্লাহ ভাই। কিন্তু আর সহ্য করতে পারছি না।

আরেকটু ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ ঠিক করে দেবেন ইনশা-আল্লাহ। আপনি মেসে চলে যান, আমি আসছি।

আব্দুল্লাহ ভাই, আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।

আমি লক্ষ করলাম ভদ্রলোক সত্যি হাঁটতে পারছেন না। পা কাঁপছে। এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। মাতালের মতো পা ফেলছেন।

আমি বললাম, থাক আপনার একা মেসে যাওয়া লাগবে না। চলুন, আপনাকে মেসে পৌঁছে দিই। তারপর আমি আমার কাজে যাই। হাত ধরুন তো দেখি।

আব্দুল্লাহ ভাই।

বলুন।

দেশে গিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে কী বলব? মেয়েদের কী বলব?

কিছু বলতে হবে না। আপনি বাড়ি গিয়ে ওরা যখন আপনার কাছে ছুটে আসবে। তখন হাসিমুখে এদের জড়িয়ে ধরবেন। এতেই তারা খুশি হবে। ভাই, চোখ মুছুন।

আমি জহুরুল সাহেবকে মেসে নামিয়ে দিয়ে তারপর গেলাম আইশাদের বাসায়। আমি নিশ্চিত আইশার বাবা একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমি তার হাত থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নেব, হাজার তিনেক টাকা নেব। হবু শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা নেয়াটা মানায় না। তারপরও নিতে হবে। পরে যখন সামর্থ্য হবে তখন ফেরত দিয়ে দেবো ইনশা-আল্লাহ। কিছু মিষ্টি কিনব। জহুরুল সাহেবের ছোট মেয়েটার জন্যে একটা বাচ্চাদের কুরআনের গল্পসংকলন কিনব। একটা বাংলা ডিকশনারি কিনব। আমি যেমন লিখতে গেলে প্রচুর বানান ভুল করি, মেয়েটাও তা-ই করে। মুখস্থের মতো সহজ বানান পর্যন্ত ভুল করে বসে আছে। এমন সহজ বানান ভুল করলে চলবে কীভাবে? এসব উপহার নিয়ে রাতের ট্রেনে রওনা হব বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুপত্নীর মেথি দিয়ে রাঁধা গোশত খেতে হবে। মাছের পোনা পাওয়া গেলে সজনে পাতা এবং পোনার বিশেষ প্রিপারেশন।

আইশার বাবাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। সে কোথায় তা কেউ বলতে পারল না। কখন ফিরবে তা-ও কেউ জানে না। দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়েছে, আর এখনো বাসায় ফেরেনি। আইশার সাথেও দেখা করা যাবে না। ইসলাম প্র্যাকটিস শুরু করার পর দুজনে ঠিক করেছি বিয়ের আগ পর্যন্ত কোনো দেখা বা কথা নেই। যদি আইশার কথা খুব মনে পড়ে তখন আইশার বাবার সাথে কথা বলি। ভালো লাগে।

রাত নটা পর্যন্ত আমি আইশাদের বাড়ির গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে রইলাম। জহুরুল সাহেব অপেক্ষা করতে থাকবেন নিশ্চয়ই। তার স্ত্রীর কাছে তাকে পৌঁছে দেয়া দরকার। সঙ্গে একটা পয়সাও নেই। ফিরে গেলাম মেসে। আল্লাহ নিশ্চয়ই কোনো একটা ব্যবস্থা করবেন। নিশ্চয়ই।

মেসের ম্যানেজার আমাকে আসতে দেখে ছুটে এল আমার কাছে। তার এভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে—বিশেষ কিছু একটা ঘটেছে। সেই বিশেষ কিছুটা কী? দুঃসংবাদ না সুসংবাদ? আইশার বাবা কী মেসে আমার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে, নাকি জহুরুল আলম ভয়ংকর কোনো কাণ্ড করে বসেছে, সিলিং ফ্যানে ঝুলে বসেছে?

না এটা হওয়ার কথা না। যারা ইসলামের ওপরে থাকে তারা কখনোই আত্মহত্যা করতে পারে না, কখনো না।

ম্যানেজার হড়বড় করে বলল, স্যার আপনি মেডিকেল কলেজে চলে যান। এই মুহূর্তে।

কেন?

জহুরুল সাহেবের অবস্থা খুব খারাপ।

কী হয়েছে তার?

চুপচাপ বসা ছিলেন। তারপর হঠাৎ ঘামতে শুরু করলেন। একবার জিজ্ঞেস করলেন আপনি কই। তারপর জোরে জোরে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করছিলেন। এক সময় শুয়ে পড়লেন। আমরা অ্যাম্বুলেন্স খবর দিতে চাইলাম। অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে রিকশায় করে নিতে হলো। দৌড়াদৌড়ি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। তার হাত-পা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে।

আমি হাসপাতালের করিডোরে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আইশার বাবা তার কথা রেখেছেন। চাকরির জন্যে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তার কাছে চাওয়া হয়েছিল। তিনি সেটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি তিনি আমার হাতে দিতে পারেননি। তাই অভিদের বাসায় গিয়ে ইরামের হাতে দিয়ে এসেছেন। ইরাম সেই চিঠি নিয়ে প্রথমে গেছে আমার মেসে। সেখানে জহুরুল সাহেবের খবর শুনে একাই রাত এগারোটার দিকে এসেছে হাসপাতালে।

জহুরুল সাহেবের জন্যে খুব ভালো একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছেন চাচা। তিরিশ হাজার টাকা বেতন। কোয়ার্টার আছে। বেতনের দশ পার্সেন্ট কেটে রাখা হবে কোয়ার্টারের জন্যে। রাত বারোটা বাজতে কিছু বাকি। আমি গেলাম জহুরুল হক সাহেবের অবস্থা কী, সেই খোঁজ নিতে। আমার সাথে ইরামও এল খোঁজ জানতে।

ডাক্তার সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, অবস্থা ভালো না, জ্ঞান ফেরেনি এখনো।

জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা কি আছে?

চান্স আছে তবে খুব কম।

কেমন কম ডাক্তার সাহেব।

বলা যায় ফিফটি ফিফটি চান্স।

আমি বললাম, ডাক্তার সাহেব এটা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। আপনার কাছে রেখে দিন, যদি জহুরুল সাহেবের জ্ঞান ফেরে, ওনার হাতে দেবেন। যদি জ্ঞান না ফেরে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে পানিতে ভাসিয়ে দেবেন।

আমি হাসপাতাল থেকে বের হচ্ছি। এখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা। এখন আমার ফেরার সময়।

ইরাম বলল, কোথায় যাচ্ছেন আব্দুল্লাহ ভাই?

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, তোমার-আমার রবের সামনে দাঁড়াতে। খোলা কোনো মাসজিদের বারান্দা খুঁজতে। আজকাল রাতে তালাবদ্ধ থাকে মাসজিদগুলো।

আপনার বন্ধুর পাশে থাকবেন না!

না। সেটার এখন দরকার হবে না।

ইরাম নিচু গলায় বলল, আব্দুল্লাহ ভাই, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি? শুধু আজকের জন্যে?

আমি বললাম, অবশ্যই পারো।

ইরাম অস্পষ্ট স্বরে বলল, আজকে যদি আমি আপনার সাথে নামায পড়ি— আপনি কি রাগ করবেন?

তোমার রবের সামনে তুমি দাঁড়াবে। এখানে আমি রাগ করার কে? তোমার আর তোমার স্রষ্টার মাঝে আমার কোনো স্থান নেই।

আমি হাঁটছি। আমার পাশেই হাঁটছে ইরাম। রাস্তার সোডিয়াম বাতির আলোয় ইরামের মুখ দেখা যাচ্ছে। ইরামের মুখে যেই অনুভূতির ছাপ রয়েছে এটা আমার খুব পরিচিত। ইসলামে প্রবেশের অনুভূতির সেই দিনটি কি আমি কখনো ভুলতে পারি!!!

সমর্পণ
প্রকাশন

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

	বই	লেখক	বিষয়বস্তু
০১	হারিয়ে যাওয়া মুক্তো	শিহাব আহমেদ তুহিন	অনুপ্রেরণামূলক
০২	সংবিৎ	জাকারিয়া মাসুদ	ইসলামের সৌন্দর্য ও নাস্তিক্যবাদের অসারতা
০৩	অ্যান্টিডোট	আশরাফুল আলম সাকিফ	নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন
০৪	সুবোধ	আলী আবদুল্লাহ	প্যারোডি
০৫	কারাগারে সুবোধ	আলী আবদুল্লাহ	প্যারোডি
০৬	সালাহউদ্দীন আইয়ুবী	শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.)	জীবনী
০৭	রৌদ্রময়ী	১৬ জন লেখিকা	জীবনঘনিষ্ঠ গল্প
০৮	বিশ্বাসের যৌক্তিকতা	ডা. রাফান আহমেদ	আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা
০৯	হুজুর হয়ে হাসো কেন?	হুজুর হয়ে টিম	রম্যরচনা
১০	জীবনের সহজ পাঠ	রেহনুমা বিনত আনিস	জীবনঘনিষ্ঠ গল্প
১১	অন্ধকার থেকে আলোতে-১	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
১২	অন্ধকার থেকে আলোতে-২	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
১৩	কিয়ামুল লাইল	শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল	তাহাজ্জুদের গুরুত্ব
১৪	সবর ও শোকর	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ (রহ.)	আত্ম-উন্নয়নমূলক

১৫	ভ্রান্তিবিলাস	জাকারিয়া মাসুদ	নাস্তিকতাবাদের খণ্ডন
১৬	প্রদীপ্ত কুটির	আরিফুল ইসলাম	অনুপ্রেরণামূলক
১৭	অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়	ডা. রাফান আহমেদ	ইসলামের সৌন্দর্য ও নাস্তিক্যবাদের অসারতা
১৮	মানসাঙ্ক	ডা. শামসুল আরেফীন	ধর্ষণের কারণ ও সমাধান
১৯	ওয়াসওয়াসা : শয়তানের কুমন্ত্রণা	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ (রহ.)	আত্ম-উন্নয়নমূলক
২০	চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান	আলী আবদুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
২১	বাতায়ন	মুসলিম মিডিয়া	সামাজিক সমস্যা ও সমাধান
২২	অংশু	হোসাইন শাকিল	নাস্তিকতাবাদের খণ্ডন
২৩	অসংগতি	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	সামাজিক অসংগতি
২৪	বিপদ যখন নিয়ামাত	মূসা জিবরীল, আলি হাম্মুদা, শাওয়ানা এ. আযীয	অনুপ্রেরণামূলক
২৫	শেষের অশ্রু	দাউদ ইবনু সুলাইমান আল-উবাইদি	তাওবার গল্প
২৬	তুমি ফিরবে বলে	জাকারিয়া মাসুদ	অনুপ্রেরণামূলক
২৭	ফী আমানিল্লাহ	হাফিজ আল-মুনাদি	দুআ ও রুকইয়া
২৮	রবের আশ্রয়ে	হাফিজ আল-মুনাদি	দুআ ও রুকইয়া
২৯	সন্ধান	হুজুর হয়ে টিম	সংশয় নিরসন
৩০	শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা	ড.আইশা হামদান	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)
৩১	অনেক আঁধার পেরিয়ে	জাভেদ কায়সার (রহ.)	অনুপ্রেরণামূলক
৩২	নবিজির পরশে সালাফের দরসে	ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহ)	আত্ম-উন্নয়নমূলক ও অনুপ্রেরণামূলক
৩৩	অন্ধকার থেকে আলোতে-৩	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
৩৪	হোমো স্যাপিয়েন্স : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি	ডা. রাফান আহমেদ	বিবর্তনবাদ ও বস্তুবাদের অসারতা
৩৫	ডাবল স্ট্যান্ডার্ড - ২	ডা. শামসুল আরেফীন	ইসলামের সৌন্দর্য ও ফেমিনিজমের অসারতা

৩৬	টাইম মেশিন	আলী আবদুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
৩৭	তুমি ফিরবে বলে (বোনদের জন্যে)	জাকারিয়া মাসুদ	অনুপ্রেরণামূলক
৩৮	কুরআন বোঝার মজা	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৩৯	তিতির	ফারহীন জান্নাত মুনাদী	উপন্যাস
৪০	হেসে খেলে বাংলা শিখি	শহীদুল ইসলাম	শিশুদের প্রাথমিক পাঠ
৪১	আল্লাহ আমার রব	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-১
৪২	ফেরেশতারা নূরের তৈরি	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-২
৪৩	আসমান থেকে এলো কিতাব	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৩
৪৪	দুনিয়ার বুকে নবি-রাসূল	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৪
৪৫	বিচার হবে আখিরাতে	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৫
৪৬	তাকদীর আল্লাহর কাছে	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৬
৪৭	মেঘপাখি	আবদুল্লাহ মাহমুদ নজীব	গল্পগ্রন্থ
৪৮	দরজা এখনো খোলা	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া	অনুপ্রেরণামূলক
৪৯	সিসাঢালা প্রাচীর	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৫০	কলবুন সালীম	মহিউদ্দীন রূপম	আত্ম-উন্নয়নমূলক

সমর্পণ
প্রকাশন

আমাদের প্রকাশিতব্য বইসমূহ

	বই	লেখক
০১	তারা ঝলমল	আরিফুল ইসলাম
০২	হেসে খেলে বাংলা শিখি - ২ ও ৩	শহীদুল ইসলাম
০৩	আশা ও প্রত্যাশা	শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ
০৪	শিশুতোষ সিরিজ - ১,২,৩	সমর্পণ টিম
০৫	প্যারেন্টিং গাইডলাইন	জামীলা হো
০৬	মুমিনের জীবনে আল্লাহর ওয়াদা	সিফাত-ঈ-মুহাম্মদ